দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ১ □ মে ২০১৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
'সব থেকে খেতে মজা গরিবের রক্ত' ... স্মরজিৎ জানা...১
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : চিটফান্ড
আর্থিক বাজারে ঠকবাজি—সারদার পঞ্জি স্কিম...সরজিৎ মজুমদার ... ৫
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের কড়াইয়ের বাচ্চা কিংবা 'সারদা'-র... তরুণ বসু ... ৭
অভিযুক্ত চিটফান্ড সংস্থা-র তালিকা...৮
সংগ্রহ : বছর গড়ায়, চরিত্র বদলায়, ... ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে... বশিষ্ঠ বসু ... ৯
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : সমবায়
এক সফল সমবায়ের গল্প ... রীতা রায়, শান্তনু চট্টোপাধ্যায় ... ১২
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি-রাজনীতি : ছয় দশক ... সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ... ১৫
বিশেষ নিবন্ধ : উত্তরবঙ্গের গ্রাম সমীক্ষা
হট্টমেলার দেশ রায়গঞ্জ... সুধাংশু চক্রবর্তী... ২০
অসুখ - বিসুখ রোগবালাই
ব্যথা যখন ঘাড়ে... পুণ্যব্রত গুণ ... ২৩
ধর্ষণ তদন্ত প্রতিবেদন
ওড়িশার কন্দমালে দলিত মেয়েদের ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত রিপোর্ট ... ২৪
ঘটনা : বিশ্বে - দেশে - রাজ্যে - নগরে - গ্রামে
'যেথায় থাকে সবার অধম সবার হতে দীন'... অনামিকা সেন ... ২৯
ওপার বাংলায় বর্ষবরণের নতুন উৎসব ... মিত্রা মুখোপাধ্যায় ... ৩০

ছবিঋণ স্বীকার : কল্যাণ রুদ্র।
প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 5 No.1 □ May, 2013
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006 WB INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

'সব থেকে খেতে মজা গরিবের রক্ত'

সক্কাল বেলায় ছোটু নর্দমা পরিষ্কার করতে এসে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল— 'বাবু আমার সব টাকা লোপাট হয়ে গেল, এখন কি হবে আমার?'

দরজার সামনে বসে পড়ে মাথা চাপড়াতে শুরু করল সে। ছোটু আমাদের ক্যাম্পাসে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘরপিছু বিশ/ত্রিশ টাকা পায় নর্দমা পরিষ্কার, জঞ্জাল সাফাই ইত্যাদির কাজ করে। সব মিলিয়ে তার প্রতিদিনের গড় রোজগার কমবেশি একশো টাকা। সেই টাকা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে গত তিন বছরে সে পনেরো হাজার টাকা জমিয়ে সারদা-য় রেখেছিল। এখন তার মাথায় হাত!

এ রাজ্যে ছোটুর মতো কয়েক লক্ষ পরিবার আজ ঘটি-বাটি হারিয়ে রাস্তায় বসেছে। তবে এখানেই শেষ নয়, আরও কয়েক লক্ষ পরিবারের কপালে যে এই খাঁড়া ঝুলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা যাদের রয়েছে তারা বহু আগেই সর্তক করে বলেছিলেন এ সব 'চিটফান্ড'-এর ভবিষ্যৎ খুব খারাপ, আর কিছুদিন বাদে বাদে এমনটাই ঘটে এসেছে এই রাজ্যে। চিটফান্ডগুলির ভূত ভবিষ্যৎ এ রাজ্যের শিক্ষিত মানুষদের কাছে অজানা নয়। দু'দশক আগে 'সঞ্চিতা', 'সঞ্চয়িতা', 'ওভারল্যান্ড' প্রভৃতি চিটফান্ডের পতন যারা নিজের চোখে দেখেছেন বা সে সব ঘটনার কথা শুনেছেন তারা এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তবু প্রশ্ন জাগে বারে বারে কেন এ ঘটনা ঘটে, বিশেষত আমাদের এই রাজ্যে? পশ্চিমবঙ্গ এখন চিটফান্ডের স্বর্গরাজ্য। এ ব্যাপারে ভারতের আর সমস্ত রাজ্যকে টপকে শীর্ষস্থানে রয়েছি আমরা। এমনকি অনেক চিটফান্ড সংস্থা তাদের কেন্দ্রীয় অফিস অন্য রাজ্যে খুললেও পরে তা সরিয়ে এনেছেন এ রাজ্যে। এমন শস্যশ্যামলা রাজ্য থাকতে কোন্ দুঃখে তারা উত্তরপ্রদেশ কিংবা বিহারে বসে থাকবেন?

লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শচীন পাইলট এই বছরের মার্চ মাসে বেআইনি চিটফান্ডের (যারা জনসাধারণের কাছ থেকে নানা অছিলায় টাকা তুলে চলেছে) এক বিশাল তালিকা পেশ করেছিলেন। সে তালিকায় সারদা ছাড়াও আরও ৭২টি চিটফান্ডের নাম রয়েছে যারা এ রাজ্যে রমরমিয়ে লোক ঠকানোর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, মন্ত্রীমহোদয়ের তালিকাটি অসম্পূর্ণ। ওই তালিকার বাইরে আরও অনেক ছোটো-বড়ো চিটফান্ড ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এবং পুরোদমে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যে। এখন এ রাজ্যের গ্রমে-গঞ্জে ঘুরলে দেখা যাবে প্রায় কোনো গ্রামই আর বাকি নেই যারা চিটফান্ডের খপ্পরে পড়ে নি।

চিটফান্ড গড়ে ওঠে এবং তার প্রসার ঘটে সাধারণ মানুষের বিশেষত অল্পশিক্ষিত, হতদরিদ্র জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং অন্ধ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় চিটফান্ডে জমানো টাকার উপর উচ্চমাত্রার সুদ পাওয়ার লোভ। সেই জায়গা থেকে বিচার করলে সারা ভারত জুড়েই খুঁজে পাওয়া যাবে চিটফান্ড গড়ে ওঠার উর্বর জমি, কিন্তু কেন বিশেষ কয়েকটি রাজ্যে এই লোক ঠকানো ব্যাবসার এত বোলবোলাও? গ্রাম শহরের খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের সংখ্যা তো কোনো রাজ্যেই কম নেই, তা সত্ত্বেও কেন পশ্চিমবঙ্গ চিটফান্ডের রাজধানী হয়ে উঠল?

এর প্রধান কারণ হলো, শুধু উর্বর ভূমি থাকলেই তো চাষ হয় না, চাষের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ জল আর সারের। প্রয়োজন আলো-বাতাসের অঢেল জোগান, তবেই না ফসলের পরিপুষ্টি। চিটফান্ডের শ্রীবৃদ্ধির জন্যও দরকার সেই 'জল-হাওয়া'। চাই রাজনৈতিক তথা ক্ষমতাবান মানুষদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহায়তা, তা না হলে চিটফান্ডের বাড়বাড়ন্ত ঘটবে কি করে? এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, বিভিন্ন সময়ে সরকারি পক্ষের মানুষজনেরা কখনও সরাসরি কখনও বা পরোক্ষে এই চিটফান্ডে জল-হাওয়া জুগিয়েছেন, কখনও বুঝে, কখনও আবার না বুঝে। চিটফান্ডের বদান্যতায় তাদের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে উপস্থিত থেকে, তাদের কাজকর্মে বাহবা দিয়ে তারা একদিকে এই সব চিটফান্ডকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন, সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। বলা বাহুল্য এই সব চিটফান্ড নিজেদের জোচ্চুরি ঢাকতে দু'চার পয়সা এখানে ওখানে ছড়িয়ে একটা 'প্রগতিশীল ইমেজ' তৈরি করার চেষ্টা করে। কখনও তারা কোনো খেলাধুলার অনুষ্ঠান, কখনও বা কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পৃষ্ঠপোষক তথা মধ্যমণি সেজে বসে। এদের মালিকেরা আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখতে যে সমর্থ হয়েছে তা এখন স্পষ্ট। এ ভাবেই ওই সব চিটফান্ডের কর্তাব্যক্তিরা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব ধীরে ধীরে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই ধারাকে বজায় রেখে পরবর্তী কালে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা চিটফান্ডের ধান্দাবাজি ও লোক ঠকানোর বিষয়গুলি পুরোপুরি আত্মস্থ করে সেখান থেকে ভাগ বাঁটোয়ারা নিতে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। সম্প্রতি সারদা-র পতন এবং তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের খতিয়ান খুলতে গিয়ে সবার সামনে সে সব ঘটনা উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, এখন তো দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতাপুষ্ট নেতা-নেতৃবৃন্দ তথা তাদের আত্মীয়স্বজন ও চ্যালা-চামুণ্ডারা এই সব নানান চিটফান্ডের নীতি-নির্ধারণ কমিটির থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত থেকেছেন এবং কি হারে তারা এইসব চিটফান্ড থেকে বিশাল পরিমাণ অর্থ প্রকারান্তরে আত্মসাৎ করেছেন (কখনও মাইনে হিসেবে, কখনও পরিষেবা নিয়ে) তার হিসেব-নিকেশের সামান্য একটু যা খবরে উঠে এসেছে তাতেই সবার চক্ষু চড়কগাছ! এর পরেও এই সব ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা নিজেদের হয়ে যে ভাবে 'সওয়াল করছেন' তাতে যে কোনো স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ভির্মি খাওয়ার জোগাড়! চিটফান্ডগুলো কতটা ক্ষমতাশালী তা বোঝা যায় যখন এজেন্ট এবং কর্তৃপক্ষ মিডিয়ার লোকদের বেধড়ক পিটিয়ে তাদের খবর খুঁজে বেড়াতে বাধা দেন।

চিটফান্ড কোম্পানি মোটামুটি ভাবে শতকরা ২০ শতাংশ হারে তাদের এজেন্টদের কমিশন দেয় রেকারিং ডিপোজিটের উপর আর শতকরা ৪০ শতাংশ কমিশন দিয়ে থাকে ফিক্সড্ ডিপোজিটের উপর। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমানতকারীদের ওই জমানো টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এক কি দেড় বছর পর। কিন্তু কী ভাবে সেটা সম্ভব, সে প্রশ্ন কেউ করে না।

আমানতকারীর টাকা দেড় বছরে দ্বিগুণ করে তার হাতে সত্যিই কি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব? অর্থাৎ এজেন্ট মারফত প্রতি ১০০ টাকায় মাত্র ৮০ টাকা বা ৬০ টাকা চিটফান্ডে এলেও মাত্র দেড় বছরের (মোটামুটি ভাবে সব চিটফান্ডই এই হারে বা এর থেকেও বেশি হারে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে) মাথায় দু'শো টাকা ফেরত দিতে গেলে লগ্নির টাকার উপর কম করেও আশি থেকে দেড়শো শতাংশ মুনাফা অর্জন করতে হবে চিটফান্ডের মালিককে। যেটা বাস্তবে অসম্ভব একটি ব্যাপার। এই সহজ অঙ্কটা তো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যদি কেউ খবরের কাগজে ভারতের বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ব্যালান্স শিট দেখেন বিশেষত যারা কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত রয়েছেন সেই সব কোম্পানির বার্ষিক মুনাফার হার সাধারণত বড়োজোর ৫ থেকে ১৫ শতাংশ বা আরও কম। তাহলে, কী এমন ব্যাবসা চিটফান্ডের মালিকরা করবেন যাতে আমানতকারীর টাকা দ্বিগুণ/তিনগুণ হয়ে যাবে? আলাদিনের প্রদীপ থাকলে আলাদা কথা, বাস্তবে এই পৃথিবীতে কোথাও সেটা ঘটানো সম্ভব নয়। তাই চিটফান্ডগুলির অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় সুদ সহ মূল টাকার অংশ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে একটা বুজরুকি বা ধাপ্পাবাজি তা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো তাহলে কী ভাবে তারা মানুষকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হন? উত্তরটা খুব সহজ। প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ ব্যাবসা শুরু করার প্রথমের দিকে অল্প কিছু আমানতকারীকে প্রতিশ্রুতি-মতো উচ্চসুদে টাকা ফেরৎ দিয়ে এই চিটফান্ডের মালিকেরা আমানতকারীর আস্থা অর্জন করে। যারা উচ্চ সুদ সহ টাকা ফেরত পাচ্ছে তারাই তার আশেপাশের মানুষজনকে ওই চিটফান্ড সম্পর্কে উৎসাহিত করেন। কিন্তু কী ভাবে তারা এত উচ্চ হারে সুদ সহ টাকা ফেরত দিচ্ছে তা অজ্ঞাত থাকে এদের কাছে। আসলে যারা টাকা জমা রাখে তারা সবাই তো একসঙ্গে টাকা তোলে না। অল্প কিছু জন তোলে, বাকিরা

আবার বিনিয়োগ করে ওই চিটফান্ডে, দ্বিতীয়ত যেহেতু এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই সবসময় কোনো না কোনো আমানতকারী চিটফান্ডে টাকা জমা দিয়ে যাচ্ছে। চিটফান্ডের মালিকেরা ওই নতুন আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকা পুরোনো আমানতকারীরদের ফেরত দিতে পারে কোনো ব্যবসায়ে ওই টাকা না খাটিয়েই। এতে চিটফান্ডের প্রতি সাধারণের আস্থা তথা লোভ বাড়তে থাকে। এ ভাবেই বাড়তে থাকে আমানতকারীদের সংখ্যাও, লাফিয়ে লাফিয়ে। এছাড়া তারা বেশ বুঝেশুনে এজেন্ট নিযুক্ত করে যারা ওই এলাকার বাসিন্দা বা ওই জনগোষ্ঠীর কাছের লোক, যেমন যৌনপল্লীগুলিতে দেখা যাবে যৌনকর্মীর সন্তানদের এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করতে। পাড়ায় যারা একটু বলিয়ে-কইয়ে তাদেরকে তারা এজেন্ট হিসেবে বেছে নেয়। এজেন্টদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত লোভনীয় কাজ কারণ সে প্রতি একশো টাকা পিছু কুড়ি থেকে চল্লিশ শতাংশ হারে টাকা রোজগার করতে পারে খুব অল্প পরিশ্রমে। ফলে তারা আমানতকারী ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলাকায়-মহল্লায়। আমার জানা এরকম বহু এজেন্ট আছে যারা অত্যন্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে এসে এই সব চিটফান্ডের এজেন্টের কাজে যুক্ত হয়ে এক দেড় বছরের মাথায় বাড়ি, গাড়ি করতে পেরেছে। চিটফান্ডের প্রতি বিশ্বাস বাড়াতে এই এজেন্টদের ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজেন্টরা আরও, আরও বেশি রোজগার করতে ছলে-বলে কৌশলে সাধারণ গরিব ও নিম্নবিত্তের মানুষদের চিটফান্ডে জড়িয়ে ফেলে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তখন চিটফান্ডগুলোয় জলের ধারার মতো টাকার বর্ষা নামতে থাকে। টাকার আমদানি বাড়লে তুলনায় কমসংখ্যক আমানতকারীকে টাকা ফেরত দেওয়া কোনো সমস্যাই হয় না। এরপর রয়েছে সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিশেষত ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহায়তা, যা চিটফান্ডগুলিকে এ রাজ্যে কার্যত মর্যাদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এরপর আর দেখে কে? চিটফান্ডের লোক ঠকানোর ব্যবসা ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দিকে দিকে। সমস্যা তৈরি হবে তখনই যখন কোনো কারণে চিটফান্ডে টাকার আমদানি কমে যায়, উল্টে টাকা ফেরত নেওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায় অথবা চিটফান্ডের মালিকেরা যখন দেদার টাকা খরচ করে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের পেছনে কিংবা আমানতকারীর টাকার বৃহৎ অংশই সরিয়ে ফেলে অন্য কোথাও। যেমনটা ঘটেছে সারদা-য়।

অন্য সব রাজ্যে চিটফান্ডের দৌরাত্ম্য ও বাড়বাড়ন্ত এ রাজ্যের মতো এতটা না হওয়ার পেছনে সম্ভবত যে সব বিষয় কাজ করেচে তা হলো, প্রথমত দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে বিগত তিনটে দশকে ছোটো আমানতকারীদের জন্য মাইক্রো ফাইনান্সের প্রভূত বিস্তার। ওই সব রাজ্যের মাইক্রো ক্রেডিট সংস্থাগুলো গ্রামে-গঞ্জে যে হারে বেড়েছে তা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এমনিতেই এই সব রাজ্যের রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের এই রাজ্য থেকে অনেক ভালো। সুদূর গ্রামগঞ্জের মানুষের কাছে মাইক্রো ফাইনান্স আজ আর তাই নতুন কোনো বিষয় নয়। এর মাধ্যমে টাকা জমা রাখা, প্রয়োজনে ধার নেওয়া এবং ছোটোখাটো ব্যবসায় তা লগ্নি বহু মেম্বারদের পক্ষেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শিল্পের বিস্তার, পাশাপাশি কর্মসংস্থান (এমনকি বিহার, ওড়িশার মতো একসময় পিছিয়ে থাকা রাজ্যেও) বৃদ্ধির প্রভাবে চিটফান্ডের প্রতি আকর্ষণ এবং টাকা জমা রাখার জন্য মানসিক নির্ভরশীলতা সম্ভবত কিছুটা কম। মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছাড়াও ব্যাংক ইনসিউরেন্স কোম্পানিগুলো যে ভাবে গ্রামে-গঞ্জে ঢুকে গেছে সেখানে রাতারাতি চিটফান্ডের ব্যবসা করা অতটা সহজ নয়। এ ছাড়াও আরও একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই রাজ্যবাসীর মধ্যে রয়েছে। সেটি হলো জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা। চিটফান্ডের মাধ্যমে রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে অনেকেই ভালোবাসে। যদিও বাঙালিরা সর্বত্র গর্ব করে বেড়ায় যে এ রাজ্যের মানুষজনেরা অন্য রাজ্যের তুলনায় রাজনৈতিক ভাবে বেশি সচেতন। তবে এই রাজ্যে চিটফান্ডের বোলবোলাও কিন্তু অন্য কথা বলে। রাজ্যবাসী যদি সত্যিই রাজনৈতিক সচেতন হয় তাহলে তারা ব্যাপক হারে চিটফান্ডের ফাঁদে কি করে জড়িয়ে পড়ে? এই দাবি নিয়ে তাই আমাদের সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সত্যিই যদি তারা সচেতন হতো তা হলে এমনটা কি ঘটতে পারত?

সারদা-র পতনের পর আমরা দেখলাম সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া মানুষজনদের শহর পানে ধাওয়া করতে, তারা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধরনা দিতেও পেছ্‌পা হলো না। কিন্তু যেটা ঘটতে দেখা গেল না, সেটা আমাদের ভাবিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। সারদা পতনের দু'সপ্তাহ পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি (সরকারি এবং বেসরকারি পক্ষে) কেন সারদা ছাড়াও আরও নামীদামি চিটফান্ডগুলোকে কাঠগড়ায় আনতে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিল না? সরকার তার নিয়মকানুন তথা পদ্ধতিপ্রকরণ অনুযায়ী এ সব বিষয়ে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেবেন আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় সেটাই স্বাভাবিক এবং সেই ধারা অনুযায়ী রাজ্যে কমিশন বসবে, নতুন আইন তৈরি হবে, কেস-কাছারি চলবে— এসবই জানা কথা। আবার এও আমাদের জানা যে, সরকারি এই সব কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বিশেষ কোনো উপকারে আসে না। অন্ততপক্ষে বিগত দিনের চিটফান্ডগুলির ভরাডুবি ও তার পরবর্তী এই ধরণের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে থাকে। পত্রপত্রিকা তাদের দায়িত্ব ও চরিত্র অনুযায়ী অসহায় মানুষের করুন আর্তি, ক্ষোভ এবং বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছে। আর যে সব চিটফান্ড তাদের কাগজে বা চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেয় তাদের সম্পর্কে নীরব থেকেছে। এ তো জানা কথা, যে-কারণে তারা সারদা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা, বিতর্কসভা আয়োজন করেছে অন্যদিকে আরও শ-খানেক চিটফান্ড যেগুলো আগামীদিনে বন্ধ হতে চলেছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে এবং প্রকারান্তরে তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে যাতে তারা আঁটঘাঁট বেঁধে আমানতকারীদের টাকা অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়ে তালা ঝোলাতে পারে। সরকার ও বিরোধীপক্ষ, বিধানসভা ও পথসভায় চিরাচরিত কায়দায় একে অপরকে দোষারোপ করছে। সেই বাঁধা গতেই সব কিছু ঘটে যাচ্ছে এবং এরকমই যে ঘটবে অনেকটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'সারদা কাণ্ড' ঘটে যাওয়ার দু'সপ্তাহ পরেও কেন ওই গরিব মানুষগুলোকে তাদের প্রাপ্য অর্থ ফিরিয়ে দিতে চিটফান্ডগুলির উপর প্রয়োজনীয় চাপ

এবং কৌশল প্রয়োগ করতে রাজনৈতিক দলগুলোর এত দ্বিধা। কি ভাবে এসব কাজ করা যায় কিভাবে চিটফাণ্ডগুলোকে দাবিয়ে রেখে সাধারণের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া যায় তা এই সব রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অজানা নয় এবং যখন এ রাজ্যে সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয় দলেরই একাধিক গণসংগঠন রয়েছে তখন কেন সে চেষ্টা করা হচ্ছে না তা বুঝতে অসুবিধা হয়। অনেকে হয়তো বলবেন এ রাজ্যের অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীই কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে আছেন চিটফান্ডগুলির সঙ্গে তাই তারা সে কাজ করতে পারছেন না। কথাটা কিছুটা সত্যি হলেও সম্ভবত পুরোপুরি সত্যি নয়। বিশেষত ভোটের ঢাকে যখন কাঠি পড়তে যাচ্ছে তখন অন্যটাই ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কারণ এদের কাছ থেকেই ভোট চাইতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে এবং এই মানুষের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। তাহলে কেন রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে তৎপর হচ্ছে না? কারণটা কি এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব যে-কারণে তারা রাজনৈতিক দলগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। আর এই ফাঁকে রাজনৈতিক কূটকচালি এবং মিডিয়ার ধুন্ধুমারে মূল বিষয়টা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তুল্যমূল্য বিচারে কোন্ রাজনৈতিক দল কতটা দোষী সেই হিসেব-নিকেশে। গরিব মানুষেরা ভাগ হয়ে যাচ্ছে দলের মধ্যে। ওই দলগুলোর অন্ধ তাঁবেদারিতে কেউ-বা দলের পক্ষে কেউ-বা দলের বিপক্ষে। মাঝখানে চিটফান্ডের মালিকেরা হাতে সময় পাচ্ছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেলার।

কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুযায়ী কম করেও ৭৩টি সংস্থা একই ধরণের লোক ঠকানোর ব্যবসায়ে যুক্ত আছে এ রাজ্যে এবং আনুমানিক হিসেবে সত্তর থেকে আশি হাজার কোটি টাকা তারা ইতিমধ্যে তুলে ফেলেছে অতি সাধারণ, দুঃস্থ এবং অল্প উর্পাজনশীল মানুষদের কাছ থেকে। সে টাকা গরিব মানুষদের কাছে ফিরিয়ে দিতে গেলে যে 'আর্থ-রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অন্য ধরণের কর্মকাণ্ড' ঘটিয়ে ফেলা দরকার, তা পারে একমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। শুধু সরকার এবং সরকারি কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ঠক্‌বাজদের জব্দ করা যাবে না— এটা সবার জানা। তাই প্রশ্ন থেকেই যায় ওই সব রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মপন্থা তথা চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে।

সারদা-য় যাদের টাকা পয়সা 'লুঠ' হয়ে গিয়েছে এবং আরও যে কয়েক লক্ষ পরিবারে একই ঘটনা প্রায় অবশ্যম্ভাবী ভাবে ঘটতে চলেছে তারা কিন্তু এই রাজ্যের অত্যন্ত সাধারণ গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। সেই কারণেই কি রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের এই গড়িমসি? খেয়াল করলে দেখবেন শিক্ষিত, মোটামুটি লেখাপড়া জানা এবং মধ্যবিত্ত মানুষজনেরা ক্বচিৎ-কদাচিৎ এই সব চিটফান্ডে টাকা রেখেছে, তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা গোষ্ঠী হিসেবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। চিটফান্ডে টাকা ঢেলেছিল তারাই যারা অর্থনীতির স্তর বিভাজনে পড়ে থাকে নীচের দিকে। এমনটা মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত সচেতন মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটলে সম্ভবত এই দলগুলিকে অন্য রকম পদক্ষেপ নিতে দেখা যেত। কারণ রাজনৈতিক নেতারা জানেন ফের ভুলিয়ে-ভালিয়ে গরিব মানুষদের ভোটের বাক্সে টেনে আনা যাবে। তাই ধরে নিতে হয় যে, এই ঠকে যাওয়া, ঘটি-বাটি হারা জনগোষ্ঠীর সত্যিকারের প্রতিনিধি এই সব রাজনৈতিক দলগুলোতে নেই। তাই হয়তো বিষয়টা এ রাজ্যের নেতা নেত্রীদের চিন্তাভাবনায় ধাক্কা দিলেও বুকে বাজে না। সরকার কিংবা বিরোধী দলের বিভিন্ন সংগঠন (ছাত্র, যুব, ট্রেড ইউনিয়ন) মুখরক্ষা করতে যতটুকু না করলে নয় কেবল ততটুকুই এখনও পর্যন্ত করে যাচ্ছে। এও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যারা বছরে পালা করে রাজপথে মিছিল করেন, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদে মুখরিত হন, এ-ব্যাপারে তাদেরকে একবারও দেখা গেল না। কাউকে টুঁ শব্দ করতে শোনা গেল না। আসলে বিষয়টা তো গরিবগুর্বোদের নিয়ে, এ সব ঘটনার তাপ-উত্তাপ বুদ্ধিজীবীদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে তেমন ছাপ ফেলে না বোধ হয়! তবু যদি বিষয়টিতে গ্ল্যামার থাকত, কিংবা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে মোলাকাত করার সুযোগ মিলত তাহলে তারা হয়তো দলবেঁধে মিছিল করতেন, মাঠে নামতেন। তাই আমাদের রাজ্যের আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাটা অনেক গভীরের। রাজনৈতিক 'সচেতনতা'র নামে এ রাজ্যে যা তৈরি হয়েছে বিশেষত বিগত দুটো দশকে, তাকে বরং এক ধরণের শক্তিশালী 'অরাজনৈতিকীকরণ প্রক্রিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণের চিন্তায় এবং জীবনযাত্রায় রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রসার তো দূর অস্ত বরং কে কোন্ দলের এবং সেই দলের স্বার্থে যে বিষয়ই হোক না কেন, তার পক্ষে লোক দাঁড় করানোটাই হলো রাজনীতি। এ ব্যাপারে দলগুলি যতই অযুক্তি এবং কুযুক্তি খাড়া করুক না কেন তাকেই সত্য বলে ধরে নিতে হবে এবং তার সপক্ষে বাকিদের দাঁড়াতে হবে। নইলে ঘনাবে অস্বিত্বের সংকট।

এই তথাকথিত রাজনীতি ও তার প্রভাবিত সংস্কৃতির প্রসার ঘটে চলেছে আমাদের রাজ্যে। আর আমরা সবাই কোনো যুক্তিতর্কের ধার না ধরে সেই আবেগেই ভেসে বেড়াচ্ছি। আমরা এবং আমাদের রাজ্যের মানুষজনেরা যে ভাবে এই গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি তাতে এই চিটফান্ডের ফাঁদে-পড়া ভুক্তভোগী মানুষজনের কোনো সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। পারিপার্শ্বিক আলোচনা এবং নানান কার্যক্রম ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছে এরা সবাই চাইছে এর মাধ্যমে কোন্ রাজনৈতিক দলের কতটা মাইলেজ বাড়বে সেটাই মুখ্য বিষয়। গরিব মানুষের কতটা লাভ-ক্ষতি হবে তা গৌণ। ফলে এটা ধরেই নেওয়া যায় যে আগামী দিনে গরিব মানুষের অসহায়তা এবং চিটফান্ডের দৌরাত্ম্য বাড়বে বৈ কমবে না। এটা আরও প্রমাণ করে যে আমাদের রাজ্যের এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোতে চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ সেই গরিবগুর্বোদের সত্যিকারের কোনো জনপ্রতিনিধিত্ব নেই। এই সব পার্টির নীতি নির্ধারণের জায়গায় এ সব মানুষজনেরা একেবারেই নেই! তাই তারা প্রতারিত হয়েছেন, হচ্ছে এবং আবারো প্রতারিত হবে। তাদেরকে নিঃসম্বল করে চলে যাবে চিটফান্ডের ধুরন্ধর মালিক-মালকিনরা, যেমনটা আগেও ঘটেছে এরাজ্যে . . . । আসলে গরিব মানুষের রক্ত খাওয়া সব থেকে 'মজার' শুধু নয় গরিব মানুষের রক্ত খাওয়া সব থেকে সহজও বটে।

স্মরজিৎ জানা

আর্থিক বাজারে ঠকবাজি—সারদার পঞ্জি স্কিম

সরজিৎ মজুমদার

সারদা গোষ্ঠী বিভিন্ন কোম্পানির ফাঁদ পেতে অসংখ্য মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ অধিক সুদের প্রলোভন দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছে। গ্রামে-গঞ্জে স্বল্প সঞ্চয়কারী মানুষ তিল তিল করে জমানো অর্থ সারদার স্থানীয় এজেন্টদের হাতে বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছিল। এখন আমানতকারীরা সব হারিয়ে পথে বসেছে। সারদার মালিক সেই টাকা আত্মসাৎ করে ফুটানি মারছিল। সংবাদপত্রে সারদা-র মালিকের ভোগবিলাসী জীবনযাত্রার বিবরণ পড়লে বোঝা যায় আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার তার কোনো ইচ্ছা ছিল না। হয়তো সম্ভবও ছিল না।

সারদার মতো আরও অনেক সংস্থা আছে যারা একই কুকর্মে লিপ্ত। রোজভ্যালি, প্রয়াগ, এমপিএস, টাওয়ার গোষ্ঠী, এটিএম, এমন অনেক সংস্থা বাজারে নেমে পড়েছে বেআইনি ভাবে। লোক ঠকানোর কারবারে। এসব সংস্থার আমানতকারীরা সারদার কাণ্ডের পর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে কবে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। প্রশ্ন হলো এই সব ভুঁইফোঁড় সংস্থা কী করে লোক ঠকাবার ব্যাবসা-র সুযোগ পেল।

এসব কোম্পানির জন্য ময়দান খোলা হয়ে গিয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতিতে। তখন থেকে ক্রমশ দেশের আর্থিক বাজার বিদেশী পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছিল। ফলে ব্যাংক, পোস্ট অফিস এবং অন্যান্য সঞ্চয়ে সুদের হার ক্রমশ কমতে থাকে। ১৯৮০-র দশকে ১০ বছরের স্থায়ী আমানতে ব্যাংকে সুদের হার ছিল ১০ শতাংশ করে। ১৯৯০-এর গোড়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সুদের হার হলো ১৩-১৪ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ থেকে সুদের হার হ্রাস পেতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে যদি কেউ ব্যাংকের চেয়ে বেশি সুদ দেয়, তাহলে মানুষ সেখানেই ছুটবে আমানত করতে। বাজার নীতির স্বাভাবিক যুক্তি ব্যবহার করে সারদা ও অন্যান্য গোষ্ঠী মানুষের সঙ্গে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে। শুধু এরাই নয়, আছে এইচডিএফসি লাইফ, রিলায়েন্স লাইফ, বিড়লা সান লাইফে-র মতো অনেক সংস্থা যারা চুপিসাড়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে, কিন্তু আমরা সেটা বুঝতেও পারি না।

সারদা রোজভ্যালি-র মতো সংস্থাগুলো একটিও চিটফান্ড নয়। এদের কেন যে চিটফান্ড বলা হচ্ছে সেটাও পরিষ্কার নয়। দু'একটি পত্রিকা এই সংস্থাগুলোকে সঠিক ভাবে পঞ্জি স্কিম বা পঞ্জি প্রকল্প হিসাবে উল্লেখ করেছে। চিটফান্ড সংস্থা ভারতে প্রচুর আছে। তাদের চরিত্র অন্যরকম। এরা সদস্যভিত্তিক সংস্থা। সদস্যরাই ফান্ডের যৌথ মালিক। প্রত্যেক সদস্য সম পরিমাণ টাকা জমা রাখে। প্রতি মাসে যে টাকাটা জমা হয় লটারির মাধ্যমে যে কোনো এক জন সদস্যকে সমস্ত জমাটাই দিয়ে দেওয়া হয়। যত দিন সব সদস্য একবার করে এই সুবিধা না পাচ্ছে, ততদিন লটারির সময় পূর্বে নির্বাচিত সদস্যরা আর বিবেচিত হবে না। এ ভাবে সকল সদস্যের একবার করে জমা টাকা পাওয়া হলে আবার সকলেই লটারিতে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। কোনো জরুরি প্রয়োজনে সদস্যরা ঋণও নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে সুদ দিতে হয় এবং সেই সুদের আয় ফান্ডের সদস্যরা সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। চিটফান্ড সংস্থা যদি ব্যবসায়িক ভাবে এই টাকা খাটায়, তাহলে লাভ বা লোকসান সকলেই সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। প্রতিটি চিট গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা সীমিত। সদস্য সংখ্যা যদি সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে, একাধিক চিট গোষ্ঠী সৃষ্ট হয়ে একটি ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। রোজভ্যালি বা সারদায় সদস্যভিত্তিক মালিকানা আমানতকারীর নেই। সুতরাং এগুলোকে চিটফান্ড বলে চিহ্নিত করা ভুল।

সারদার মতো সংস্থাকে পঞ্জি প্রকল্প বললেই ঠিক হয়। পঞ্জি ব্যবসাটার ধরণ দেখলেই বোঝা যায় সেখানে আমানতকারীর টাকা মোটেই সুরক্ষিত নয়। পঞ্জি প্রকল্পগুলো বাজারে চালু সুদের থেকে অনেক বেশি সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমানতকারীকে প্রলুব্ধ করে। এর আসল বৈশিষ্ট্য হলো পুরোনো আমানতকারীকে সুদ দেয় নতুন আমানতকারীর টাকায়। ধরা যাক দু'জন প্রথম বছর ২০ শতাংশ সুদের প্রতিশ্রুতিতে ১০,০০০ করে মোট ২০,০০০ টাকা পাঁচ বছরের স্থায়ী আমানত রাখল। আগামী বছরে যদি আরও দু'জন একই প্রতিশ্রুতিতে ১০,০০০ করে আমানত রাখে তাহলে নতুন আমানত থেকে বিগত বছরের আমানতের ৪,০০০ টাকা এ বছরের ২০,০০০ টাকা আমানত থেকে শোধ করা হবে। তৃতীয় বছরে সুদের দায় কিন্তু মোট ৮,০০০ টাকা (প্রথম বছরের আমানতকারীদের ৪,০০০ + দ্বিতীয় বছরের আমানতকারীদের ৪,০০০ টাকা)

হয়ে গেল। সেটা মেটানো হবে তৃতীয় বছরের নতুন আমানত থেকে। ক্রমশ সুদাসলের বোঝা বাড়ছে। যদি তৃতীয় বছরে আমানতকারী না পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সুদে আসলে যে টাকাটা আমানতকারীর প্রাপ্য, সেটা পঞ্জি মালিকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসার প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য— পুরোনো দিনের আমানতের স্রোতের চেয়ে ভবিষ্যৎ আমানতের স্রোত বেশি হতে হবে। ভবিষ্যতে আমানতকারীর সুদাসল কি করে শোধ করা হবে সেটা অনিশ্চিত।

এমন নয় যে, আমানতকারীর টাকাটা পঞ্জি মালিক ফেলে রাখে। তারা সে টাকা বিভিন্ন লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু ওই মুনাফা থেকে তারা আমানতকারীর সুদ দেয় না। অধিকাংশ সময় পঞ্জি আমানতের অর্থ হেজ ফান্ড বা শেয়ারের ফাটকা বাজারে খাটানো হয়। সেটাও যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এই ব্যাবসা যদিও শুরু করেছিল চার্লস পঞ্জি নামে এক ইতালীয়, কিন্তু একটা বড়ো পঞ্জি সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল বারনার্ড ম্যাডফ নামে একজন আমেরিকান। সে পঞ্জি আমানতের টাকায় ওয়াল স্ট্রিটে ফাটকা খেলত। ২০০৮ সালে মার্কিনী মন্দার সময় তার পঞ্জি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। মার্কিন বিচারালয় তাকে ১৫০ বছরের হাজতবাসের শাস্তি দিয়েছে। রোজভ্যালি, টাওয়ার গ্রুপ, সারদা পঞ্জি ব্যাবসাই করে। এরা এক আমানতকারীর টাকায় অন্য আমানতকারীকে সুদ দেওয়ার জাল বিস্তার করে। ভাবে তারা জমি, হোটেল বা সম্পত্তির মুখোশ সামনে রেখে চিরকাল অর্থ উপার্জন করে যাবে। সারদা-র ক্ষেত্রে আগত দিনের আমানতের স্রোত ক্রমশ কমে আসছিল, তাই বিগত দিনের গরিব/নিম্নবিত্ত আমানতকারীরা মার খেল। অন্যদেরও মানুষ এখন সন্দেহের চোখে দেখছে। এদেরও আগত দিনের আমানতের স্রোত কমতে বাধ্য।

রোজভ্যালি, সারদা, টাওয়ার ইত্যাদি সংস্থা উঁচু হারে সুদের লোভ দেখিয়ে টাকা তোলে। তার ওপরে এজেন্টদের কমিশন (১৫-৩০ শতাংশ) দিয়ে অফিস চালানোর খরচ ইত্যাদি সামলে কাউকে উঁচু সুদ দেওয়া সম্ভব? এজেন্টরা এই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে সহজ সরল আমানতকারীদের ডুবিয়েছে।

এই ব্যবসাগুলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নামে Registar of Companies-এর তালিকাভুক্ত। এসব কোম্পানির বাজার থেকে টাকা তুলে ব্যবসা করার অধিকার নেই। শুধু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো বাজারে শেয়ার বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট লিমিটেড পঞ্জি কোম্পানিগুলো বাজার থেকে বে-আইনি ভাবে টাকা তুলছে। সরকারের কঠোর নজরদারি এখানেই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নেতা মন্ত্রীদের জড়িয়ে এই নজরদারি এড়িয়েছে সারদা। সরকারকে এই দায় নিতেই হবে।

সরকারের নজরদারির অভাবে পঞ্জি প্রকল্পগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অত চড়া হারে সুদের লোভে মানুষ সরকারি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পোস্ট অফিসে স্থায়ী আমানত, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রতি বছর টাকা জমার অঙ্ক কমেছে। নভেম্বর ২০১২-তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে নিট জমার পরিমাণ ঋণাত্মক রাশিতে নেমে গিয়েছিল। নিট জমা ছিল (-) ২১০ কোটি টাকা। এতে রাজ্য সরকারেরই ক্ষতি হয়েছে। কারণ সরকার চালাতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের জমা টাকার ৮০ শতাংশ রাজ্যগুলো সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারে। সেই সুযোগটা হাতছাড়া হলো এই সব পঞ্জি কোম্পানির অসাধু ব্যাবসার কারণে।

লোক ঠকাবার ব্যাবসা হিসাবে শুধু পঞ্জি প্রকল্পকে দোষ দিলে চলে না। সংগঠিত আর্থিক বাজারে যারা লোক ঠকাচ্ছে তারাও সমান দোষী।

বড়ো সংস্থাগুলোও মানুষকে সর্বস্বান্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। যেমন এইচডিএফসি লাইফ (HDFC LiFe) কতগুলো প্রকল্প মানুষের কাছে তুলে ধরে যেগুলো সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজ খবর নিয়ে বিনিয়োগ না করলে ঠকবার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ। HDFC Standard Life নামে একটি বিমা প্রকল্পে ১০ বছরে ১,৫০,০০০ টাকা (sum assured) পাওয়ার লক্ষ্যে, সাত বছর যাবৎ প্রিমিয়াম দিতে হবে মোট ১,৫৮,১৬১ টাকা (এর মধ্যে পরিষেবা কর ও অন্যান্য শুল্ক ধরা নেই)। এই প্রকল্প যে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি টাকা বিমাকারীকে দিতে হচ্ছে। এই প্রকল্পে লাভ কোথায়? সংস্থা বলছে ১০ বছর যাবৎ বোনাস দেওয়া হবে, যা ওই ১,৫৮,১৬১ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বোনাস প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি তারা চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে বোনাস কত পাবে, আদৌ পাবে কি না, তা নির্ভর করছে সংস্থার বিনিয়োগের সাফল্যের ওপর। সংস্থার বিনিয়োগে যদি মুনাফা না আসে তাহলে ১,৫৮,১৬১ টাকা দিয়ে ১,৫০,০০০ টাকা নিতে হবে। এখানেও প্রতারণা।

সুতরাং দোষী শুধু রোজভ্যালি বা সারদা-ই নয়, সংগঠিত আর্থিক বাজারেও প্রতারক আছে। এরা ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও এই প্রতারণার প্রতিকার কে করবে? 'জয় উদারনীতির জয়।'□

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বা স্থ্যে র বৃ ত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী
দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রা প্তি স্থা ন : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট)
পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড) অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধান নগর পুরসভা) শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল),
হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

গ্রা হ ক চাঁ দা :
১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ। কলকাতার বাইরের চেকের জন্যে অতিরিক্ত ৩০ টাকা)।

পা ঠ ক ও এ জে ন্ট রা যো গা যো গ ক রু ন :
৯৮৩০ ৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১ ০১২৫৩৭

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের কড়াইয়ের বাচ্চা কিংবা ‘সারদা’-র গণেশ

তরুণ বসু

নাসিরুদ্দিনকে কি আপনারা চেনেন? না, না মুম্বাই ফিল্মের অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ নয়, মোল্লা নাসিরুদ্দিন! না চিনলেও অসুবিধে নেই। মোল্লার কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন। তো সেই মোল্লার কথা দিয়েই শুরুটা হোক।

হলো কি, একবার মোল্লার একটা বড়ো লোহার কড়াইয়ের খুব দরকার পড়ল। তো মোল্লা গেল তার পড়শির কাছে কড়াই ধার করতে। সে তো ধার শুনে একটু ইতস্তত করছিল। ভাবছিল, কড়াইটা আবার ফেরত পাবো তো! কিন্তু, এক তো মোল্লার নাছোড় ভাব তারপর কাজি-র সঙ্গে তার জানাশোনা ইত্যাদির কথা শুনেটুনে শেষমেশ দিয়েই দিল।

কদিন পর মোল্লা ধার করা কড়াইটার মধ্যে আর একটা ছোটো কড়াই বসিয়ে পড়শিকে ফেরত দিতে গেল। দুটো কড়াই দেখে সে মোল্লাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আর একটা ছোটো কড়াই কোত্থেকে এল?’

মোল্লা বলল, ‘তুমি যখন আমায় কড়াইটা ধার দিয়েছিলে তখন ওর বাচ্চা হবার সময় হয়েছিল। আমার বাড়ি গিয়ে দু’দিন পরেই একটা বাচ্চা দিয়েছে। আমি মা কড়াই সমেত বাচ্চাটাকেও ফেরত দিয়ে গেলাম।’

‘খুব ভালো, খুব ভালো! মোল্লা তোমার যখনই কড়াইয়ের দরকার হবে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও’— বলে পড়শি মনের আনন্দে দুটি কড়াই-ই নিয়ে নিল।

কিছুদিন বাদেই মোল্লা আবার গেল ওই পড়শির বাড়িতে কড়াই ধার করতে। গিয়ে বলল, এবার তার দরকার খুব বড়ো একটা কড়াই। অনেক অতিথি এসেছে বাড়িতে। পড়শি নির্দ্বিধায় তার সবচেয়ে বড়ো কড়াইটা বার করে দিল আর মোল্লাও সেটা বগলদাবা করে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে।

এরপর দু’দিন যায়, তিনদিন যায়, সাতদিন যায়, মোল্লা আর কড়াই ফেরত দিতে যায় না। এদিকে এত দিন কেটে যাওয়ায় পড়শি তো রেগেমেগে অস্থির। একবার ভাবছে কাজির কাছে নালিশ জানাবে, পরক্ষণেই ভাবছে, মোল্লার তো আবার কাজির সঙ্গে জানাশোনা আছে, ফলে তাতে সুবিধে হবে না! এসব সাতপাঁচ ভেবে সে মোল্লার বাড়িতে যাবে ঠিক করল যেদিন, সেদিনই মোল্লা গাধার পিঠে চড়ে তার বাড়িতে হাজির।

পড়শি তো খুব হাউমাউ করে তেড়েমেড়ে গিয়ে মোল্লাকে বলল, ‘আমার কড়াই কোথায়?’

মোল্লা তার উত্তরে বলল, ‘....’

না, সেটা এখন বলা যাবে না, জানা যাবে এই লেখার শেষতক পৌঁছোলে তবে। ততক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে মাঝের কথাগুলো শুনতে হবে। হবে কারণ আমাদের মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে মোল্লার উত্তরের মিল এক্কেবারে যাকে বলে ‘অবাককাণ্ড’।

‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ — এই ইচ্ছা আম বাঙালির বহুদিনের — বিশেষত নিম্ন আয়ের বঙ্গবাসীর। এই ইচ্ছাপূরণের লোভে নিরুপায় হয়েও মাঝেমাঝে সে বড়োই ঝুঁকি নিয়ে ফেলে। আর এই ঝুঁকিটা যখন সে নেয়, তখন একদিকে যেমন যুক্তি-বুদ্ধির মাথায় খিল মেরে রাখে তেমনই অন্যদিকে থাকে গভীর বিশ্বাস, আর এক অলীক আশা। এর পরিণতি তাকে শেষ পর্যন্ত এক আত্মঘাতী সম্ভাবনার দিকে ঠেলে দেয়। এই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে এমনই এক ঘটনা পরিণতি পেল। যার জেরে ৩ মে ২০১৩ পর্যন্ত আত্মহননের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০। এই আত্মহনন সঞ্চিত শেষ ভরসার অর্থটুকু হারানোর হতাশায়। এতে সামিল শুধু তারাই যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের সব থেকে পেছিয়ে পড়া শ্রেণি। শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে তাদের অনেকেরই জীবন থেকে পালানো ভিন্ন বাঁচার অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। আর-একটু খুলেই বলা যাক।

১৪ এপ্রিল ২০১৩-য় পঞ্জিপ্রকল্প সারদা কোম্পানির সাম্রাজ্য শেষমেশ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। অবশ্য এমন নয় যে, রাতারাতি একদিনেই ভেঙে পড়েছে। অনেক দিন ধরেই এই অসাধু কারবার খুবই স্বাভাবিক ভাবেই ভাঙছিল। সেটা এর মালিকরাও বুঝে গিয়েছিল, তাই কায়দা মতো নিজেদের ঘর-দুয়ার গুছিয়ে ডাঙায় উঠে বসতে চেয়েছিল। তবে সেটায় কিছুটা হলেও বাধা পড়েছে। আর এসবের ফলে কয়েক লক্ষ স্বল্প আমানতকারী-র বহু শ্রমে অর্জিত অর্থের পুরোটাই মার গেল। ভুল বললাম। মেরে দেওয়া হলো। বাড়ি বাড়ি কাজ করা মহিলা, রিক্সা, ভ্যান, অটো চালক, সাধারণ অতি ছোটো ব্যাবসাদার, কৃষি-মজুর, হকার, ছোটো কারখানায় কাজ করা মজুর থেকে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অতি কষ্টে অর্জিত অর্থ

এরপর ১১ পাতায় ➔

অভিযুক্ত চিটফান্ড সংস্থা-র তালিকা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শচীন পাইলট ১৪ মার্চ ২০১৩-য় লোকসভায় ৪৪নং এক প্রশ্নের উত্তরে অভিযুক্ত চিটফান্ড সংস্থাগুলির একটি রাজ্যভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের স্থানই শীর্ষে। ৭৩টি এইরকম কোম্পানির নাম রয়েছে এই তালিকায়। পশ্চিমবঙ্গের তালিকায় এমন বেশ কয়েকটি কোম্পানির নাম আছে, যেগুলির সঙ্গে শাসকদলও যুক্ত।

১. মেসার্স রোজভ্যালি ইনডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
২. মেসার্স সিলভারভ্যালি কমিউনিকেশন লিমিটেড।
৩. মেসার্স রোজভ্যালি ফুড বেভারেজ লিমিটেড।
৪. মেসার্স রোজভ্যালি মার্কেটিং ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৫. মেসার্স রোজভ্যালি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড।
৬. মেসার্স রোজভ্যালি হোটেলস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টস লিমিটেড।
৭. মেসার্স রোজভ্যালি প্রোজেক্টস লিমিটেড।
৮. মেসার্স রোজভ্যালি ফিল্মস লিমিটেড।
৯. মেসার্স রোজভ্যালি ট্র্যাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড।
১০. মেসার্স মডার্ন ইনভেস্টমেন্ট ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
১১. মেসার্স ব্র্যান্ড ভ্যালু কমিউনিকেশন লিমিটেড।
১২. মেসার্স রোজভ্যালি হাউসিং ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন।
১৩. মেসার্স রোজভ্যালি এয়ারলাইনস লিমিটেড।
১৪. মেসার্স রোজভ্যালি ফাশনস লিমিটেড।
১৫. মেসার্স রূপসী বাংলা প্রোজেক্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড।
১৬. মেসার্স রূপসী বাংলা মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট লিমিটেড।
১৭. মেসার্স রোজভ্যালি রিয়েলিটি লিমিটেড।
১৮. মেসার্স রোজভ্যালি রিয়্যাল এস্টেটস কনস্ট্রাকসনস লিমিটেড।
১৯. মেসার্স সারদা প্রিন্টিং এবং পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড।
২০. মেসার্স সারদা অ্যাগ্রো ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড।
২১. মেসার্স সারদা বায়োগ্যাস প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড।
২২. মেসার্স সারদা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড।
২৩. মেসার্স সারদা অটোমোবাইলস ইন্ডিয়া লিমিটেড।
২৪. মেসার্স সারদা কনস্ট্রাকশনস কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।
২৫. মেসার্স সারদা শপিংমল প্রাইভেট লিমিটেড।
২৬. মেসার্স সারদা এডুকেশন এন্টারপ্রাইস লিমিটেড।
২৭. মেসার্স সারদা এক্সপোর্টস লিমিটেড।
২৮. মেসার্স সারদা রিয়েলিটি ইন্ডিয়া লিমিটেড।
২৯. মেসার্স আরটিসি প্রপার্টিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৩০. মেসার্স আরটিসি রিয়েল ট্রেড ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৩১. মেসার্স যশোদা রিয়েল এস্টেট লিমিটেড।
৩২. মেসার্স গোল্টমাইন অ্যাগ্রো লিমিটেড।
৩৩. মেসার্স টাওয়ার ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড।
৩৪. মেসার্স চক্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড।
৩৫. মেসার্স গোল্ড ফিল্ড অ্যাগ্রো লিমিটেড।
৩৬. মেসার্স গোল্ডেন লাইফ অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৩৭. মেসার্স গোল্ডেন পরিবার হোল্ডিং অ্যান্ড ডেভেলপার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৩৮. মেসার্স গোল্ডমাইন ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড।
৩৯. মেসার্স হ্যালো ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস সেলস লিমিটেড।
৪০. মেসার্স হ্যাপী লাইফ রিয়েলটি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড।
৪১. মেসার্স আইকোর ই-সার্ভিস লিমিটেড।
৪২. মেসার্স এমপিএস অ্যাকোয়া মেরিন প্রোডাক্টস লিমিটেড।
৪৩. মেসার্স এমপিএস গ্রিনারি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড।
৪৪. মেসার্স এমপিএস ইনডাস্ট্রিজ অ্যান্ড অ্যাগ্রো রিসার্চ লিমিটেড।
৪৫. মেসার্স এমপিএস রিসর্টস অ্যান্ড হোটেলস লিমিটেড।
৪৬. মেসার্স প্রয়াগ অ্যাগ্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড।
৪৭. মেসার্স প্রয়াগ ইনফোটেক হাই-রাইজ লিমিটেড।
৪৮. মেসার্স প্রয়াগ ইনফ্রা রিয়েলটরস লিমিটেড।
৪৯. মেসার্স প্রয়াগ মাইক্রো ফিনান্স লিমিটেড।
৫০. মেসার্স রাহুল হাইটস লিমিটেড।
৪১. মেসার্স রাহুল হাই-রাইজ লিমিটেড।
৫২. মেসার্স র‍্যামেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
৫৩. মেসার্স সাইন ইন্ডিয়া অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
৫৪. মেসার্স সিলিকন প্রোজেক্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৫৫. মেসার্স সানসাইন অ্যাগ্রো ইনফ্রা লিমিটেড।
৫৬. মেসার্স সানসাইন ইন্ডিয়া ল্যান্ড ডেভেলপারস লিমিটেড।
৫৭. মেসার্স ইউরো অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৫৮. মেসার্স ইউরো অটোটেক লিমিটেড।
৫৯. মেসার্স ইউরো হোটেলস অ্যান্ড রিসর্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৬০. মেসার্স ইউরো হাইজেনিক গুডস লিমিটেড।
৬১. মেসার্স ইউরো ইনফোটেক লিমিটেড।
৬২. মেসার্স ইউরো ইনফ্রা রিয়েলটি ইন্ডিয়া লিমিটেড।
৬৩. মেসার্স ইউরো লাইফ কেয়ার লিমিটেড।
৬৪. মেসার্স ইউরো ট্রেকসিম লিমিটেড।
৬৫. মেসার্স ইউরো ওয়াকার্স লিমিটেড।
৬৬. মেসার্স সানমার্গ লিমিটেড।
৬৭. মেসার্স বসুন্ধরা রিয়েলকন লিমিটেড।
৬৮. মেসার্স ভিবজিওর অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
৬৯. মেসার্স ভিবজিওর অ্যালায়েড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড।
৭০. মেসার্স বিশ্বমিত্র ইন্ডিয়া কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড।
৭১. মেসার্স বিশ্বমিত্র ইন্ডিয়া মাল্টি ডেভেলপার্স লিমিটেড।
৭২. মেসার্স ওয়ারিস হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেড (বর্তমানে ওয়ারিস হেল্‌থকেয়ার লিমিটেড)।
৭৩. মেসার্স ওয়ারিস টেলিকম সার্ভিসেস লিমিটেড (ওয়ারিস টেল ইন্টারন্যাশানাল লিমিটেড)।

বছর গড়ায়, চরিত্র বদলায়, কিন্তু ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে

বশিষ্ঠ বসু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় বেঁচে গেলেন ঠিক এই সময় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন নেই তাই। থাকলে, হয়তো গদি ধরে রাখতে পারতেন না। ২০১৬-তে কী হবে সেটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে লাভ নেই। তবে চিটফান্ডের জের যদি ২০১৪ পর্যন্ত চলে, লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বেগ পেতে পারে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে এত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যে অতি বড়ো বন্ধুও বিগড়ে যাবে।

ঘটনাটি শুধু টাকা লোকসানের কাহিনি নয়। আর্থিক কেলেঙ্কারি এই দেশে বহুবার হয়েছে, এবং যে সব ক্ষেত্রে সাধারণ ছা-পোষা মানুষ যুক্ত ছিলেন, প্রতি সময়তেই তারা হাত পুড়িয়েছেন। হর্ষদ মেহেতা কেলেঙ্কারিতেও যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেই একই রকমের ক্ষতি হয়েছিল কেতন পারেখ কেলেঙ্কারিতেও। সঞ্চয়িতা কাণ্ডে যা ঘটেছিল, পরবর্তী কালে নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিদের কেলেঙ্কারিতেও তো একই রকম কাণ্ড হয়েছিল। যতবার হাত-পা-মুখ পোড়ে, যতবার ঘর-বাড়ি সংসার উজাড় হয়ে যায় কারও লালসার জন্য, ততবারই কান্নার রোল ওঠে, মানুষ মনে করে এর থেকে বড়ো বিপর্যয় আগে কখনও আসেনি।

মূল কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো; লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্রাচীন এই প্রবাদবাক্যটি সাধারণ মানুষ বারবার ভুলে যায়, এবং তাই বারবার মরে। একই সঙ্গে এটাও বলে রাখা ভালো যে সারদা-কাণ্ডেও যদি আক্কেল না হয়, পরে কোনো রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কাণ্ডে আবার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই মৃত্যুর জন্য অপরকে দোষ দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। অপরে কী করবে যখন লাভটা নিজের?

লোভ, ক্ষোভ বা লোকসানের কথায় পরে আসা যাবে, কিন্তু তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে একটি বিনীত পরামর্শ আছে। একটু লোক বুঝে, স্থান-কাল-পাত্র হিসেব করে সখ্যতা করুন ভবিষ্যতে। মন্ত্রীদের কাছাকাছি যেতে চায় তো কত মানুষই। এটি বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে বিনা মতলবে খুব কম লোকই ঘনিষ্ঠতা চায়। 'মানুষ'-এর মধ্যে সব রকমই লোক থাকে, তাই একটু তো তফাত রাখতে হয়, বিশেষত দায়িত্বশীল কোনো ভূমিকায় থাকলে। সেটাই আখেরে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

টেলিভিসনের পর্দায় সারদা গোষ্ঠীর যত এজেন্ট বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করছেন দেখা যাচ্ছে, হতে পারে তারা সবাই বিরোধী দলের লোক। যদিও সেটা বিশ্বাস করার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। তবুও, সবার মুখে শোনা যাচ্ছে একটাই কথা। 'টাকা দিয়েছিলাম কারণ সবাই বলছিল, ছবি দেখাচ্ছিল যে দিদির সঙ্গে, তৃণমূল দলের মন্ত্রীদের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর কর্ণধাররা কত ঘনিষ্ঠ।' উদ্দেশ্য থাক বা না থাক, এই কথাগুলি শুনতে হতো না যদি দূরত্ব বজায় রাখতেন মমতা এবং তার মন্ত্রীরা। চিটফান্ডে টাকা ঢালতে নিশ্চই মমতা বলেননি, সেই সিদ্ধান্ত যে যার নিজের। কিন্তু, 'মাখামাখি'র যে কথাটি প্রকাশ্যে উঠছে, সেটি হয়তো এড়ানো যেত সময় মতো সাবধান হলে।

বস্তুত, সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে চিটফান্ডদের রাজত্ব। বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে দীর্ঘদিন ধরে ভেসে উঠছে এরকম সকল গোষ্ঠীর নাম। বিগত দু'তিন বছরের মধ্যে ভুঁইফোঁড়ের মতো গজিয়ে উঠেছে খবরের কাগজ, হোটেল, রেসর্ট, আবাসন প্রকল্প এবং আরও কী। সবারই চোখে পড়েছে এই সব, সবাই জানত যে এইগুলি সবই চিটফান্ড।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে কেন জানতেন না? মা, মাটি আর মানুষ নিয়ে যাঁর কারবার, তাঁর বা তাঁর অর্থদপ্তরের কেন এটা মনে হয়নি যে চিটফান্ডের ব্যাবসা বিপজ্জনক, যে অসংখ্য 'মা' ও মাটির কাছের মানুষদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই ব্যাবসা চলছে, যে মানুষ টাকা ঢালেন কারণ তাদের বড়ো বড়ো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সুদের ব্যাপারে। কেন মনে পড়েনি সঞ্চয়িতার কথা, সঞ্চয়নী, ওভারল্যান্ডের কথা, কেন সাবধান হননি বা সাবধান করেননি মানুষকে? বিশেষত যেখানে তৃণমূলেরই সাংসদ সোমেন মিত্র কতদিন আগে এই সব চিটফান্ড নিয়ে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে।

চিটফান্ড নতুন কিছু নয়, বহু পুরোনো ব্যাপার। শোনা যায় যে আর্য-অনার্যদের সময়েও নাকি এই প্রথা চালু ছিল অনার্যদের মধ্যে। আগে নাকি বলা হতো চিট্টি, যা থেকে চিট। কোচিন অঞ্চলে বলত 'কুরি', মালাবার অঞ্চলে 'পায়াত্তু'। ঊনবিংশ শতকে চিটফান্ড বেশ জনপ্রিয় হয় দক্ষিণ ভারতে। শোনা যায় যে কোচিনের এক রাজা, রাম ভার্মা, নাকি এই প্রথা অবলম্বন করে টাকা ধার দিয়েছিলেন সিরিয়া থেকে আগত ক্রিশ্চান ব্যবসায়ীদের। আরও শোনা

যায় যে চিটফান্ড চালু ছিল চিন, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কাতেও। বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত সিভিএন চিটফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যে আনুমানিক ১৮৩০-৩৫ সাল নাগাদ আধুনিক চিটফান্ড ব্যাবসা শুরু হয়। ত্রিশূরে অবস্থিত চালদিন সিরিয়ান চার্চ এই ব্যাবসা শুরু করে 'কুরি' নাম দিয়ে। জনশ্রুতি আছে যে আসলে চিন দেশ থেকে আগত পর্তুগিজ মিশনারিরা যখন কেরলের ত্রিশূরে আসেন ১৫৭৭-এ, তখন ওঁরা ওখানে চিটফান্ডের প্রথা চালু করেন।

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২, ২(১) (h) ধারা অনুযায়ী চিটফান্ডের সংজ্ঞা হলো: 'চিটফান্ড কোম্পানি মিনস আ কোম্পানি ম্যানেজিং, কনডাক্টিং অর সুপারভাইজিং, অ্যাজ ফোরম্যান, এজেন্ট অর ইন এনি আদার ক্যাপাসিটি, চিটস অ্যাজ ডিফাইন্ড ইন সেকশন ২ অফ দ্য চিটফান্ডস অ্যাক্ট, ১৯৮২।' এই চিটফান্ড অ্যাক্ট, ১৯৮২ কেন্দ্রীয় আইন। এছাড়া আছে কেরালা চিট্টিস অ্যাক্ট, ১৯৭৫, তামিলনাড়ু চিটফান্ডস অ্যাক্ট ১৯৬১, দ্য চিটফান্ডস (কর্নাটক) রুলস ১৯৮৩, দ্য অন্ধ্র-প্রদেশ চিটফান্ডস অ্যাক্ট ১৯৭১, দিল্লি চিটফান্ডস রুলস ২০০৭ এবং মহারাষ্ট্র চিটফান্ডস অ্যাক্টস ১৯৭৫। পশ্চিমবাংলার কোনো চিটফান্ড আইন নেই। তাই, যত কাণ্ড কাঠমান্ডু (থুড়ি) কলকাতাতেই!

সঞ্চয়িতা কাণ্ডর পর থেকে চিটফান্ড কথাটার একটা রেওয়াজ হয়েছে। ব্যাংক বা পোস্ট অফিসেও লোকে টাকা রাখে ফিক্সড ডিপোজিট করে, সুদ খায়। বিভিন্ন কোম্পানির ঘরেও টাকা রাখে মানুষ, সুদ খায়। ব্যাংকরা অনেক সময়ই বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায় যে তারা 'টার্ম ডিপোজিট'-এ কত সুদ দিচ্ছে, এবং তাই দেখে লেকে ছোটে টাকা রাখতে।

আজকাল তো আবার ৬০ বছরের মানুষজনকে একটু বেশি সুদ দেওয়ার রেওয়াজ। তাই নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া বেধে যায়। যেমন, পঙ্কজের বেধেছিল তার বাবার সঙ্গে। কোথায় বিজ্ঞাপন দেখে বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা স্টেট ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে অন্য একটি বেসরকারি ব্যাংকে রাখবেন কারণ সেখানে ০.৭৫ শতাংশ সুদ বেশি দেবে। এমন বহু বারই হয়েছে যে নামীদামি কোম্পানির ঘরে টাকা 'ফিক্সড' করে, পরে সেই টাকা পেতে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গেছে কারণ কোম্পানির অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায়, ফিক্সডের টাকা তারা ফেরত দিতে পারছে না। বিদেশে বহু ব্যাংকও 'ফেল' করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাকি এই বছরেই তিনটি ব্যাংক ফেল করেছে, এবং ২০০৮ থেকে ২০১২-র মধ্যে ৪৫০-এর ওপর নাকি এরকম ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু ব্যাংক, পোস্ট অফিস, কোম্পানি-এরা কুলীন ব্রাহ্মণ। এদের কেউ অবজ্ঞা করে 'চিটফান্ড' বলে না। সাধারণ লোকের মনে 'চিটফান্ড' হলো নিতান্ত ছোটোখাট খুচরো টাকা তোলার কোম্পানি কিছু, যারা এজেন্ট মারফত টাকা তোলে, আর সেই টাকার ওপর বেশ ভালো সুদ দেয়। লোভ, লোভই হয়। কাজেই বেশি সুদ পাওয়ার লোভে, ব্যাংক পোস্ট অফিসের ঘর থেকেও সর্বস্ব টাকা তুলে নিয়ে এই চিটফান্ডগুলিতে মানুষ টাকা লাগায়।

কিন্তু যেগুলি 'চিটফান্ড' বলে খ্যাত বা অখ্যাত, সেগুলি আসলে চিটফান্ড কী?

কেতাদুরস্ত চিটফান্ডের কিছু নিয়মাবলী হয়, এবং সেগুলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু, আসলে হয় কী? কাঁচা টাকা নিয়ে কারবার করার একটা ব্যাপার আছে। দাবানল যেমন ছড়ায়, ফান্ডগুলির কর্ণধারদেরও লোভ তেমনি বেড়েই যায় সামনে। যেতে, যেতে একটা সময় আসে যখন এত বেশি গ্রাহক হয়ে যায় যে, পুরোনো গ্রাহকদের টাকা নতুন গ্রাহকদের টাকা নিয়ে মেটানো হয়ে থাকে খুব সহজেই। গোলমাল বাধে যদি টাকার আমদানিটা যায় কমে, নানা আইনের প্যাঁচে পড়ে বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের তুষ্ট রাখতে গিয়ে জনগণের টাকর বেহিসেবি খরচ হতে থাকে। বোধকরি সারদা-র সুদীপ্ত সেনের ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

এই সুদীপ্ত সেন, অনুকূল মাইতি, রামেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গৌতম কুণ্ডু — এরা কারা? শিয়ালদহ স্টেশনে রোজ ৯.৩০-এ ট্রেন থেকে নেমে, যে জনস্রোত প্রতিদিন দৌড়োতে থাকে ডালহাউসি বা ধর্মতলা অভিমুখে, তাদের মধ্যে এরকম সুদীপ্ত-অনুকূল-রামেন্দু হাজার হাজার থাকে। তফাত হলো এই, যে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে মরে কিছু লোক, আর তাদেরই টাকা খাটিয়ে গাড়ি-বাড়ি-জমি-জায়গা ফেঁদে দিব্যি রাজ করে অন্য কিছু লোক। কেন এমন হয়?

যাওয়া যাক একটু ইতিহাসে, ঢোকা যাক আগ্নেয়গিরির গর্ভে— সেই প্রথম লাভা উগরে ওঠা দিনগুলিতে। ১১৩এ রিপন স্ট্রিটে মুরারকা পেইন্টস অ্যান্ড ভার্নিস ওয়াকর্স প্রাইভেট লিমিটেড-এ টাইপিস্ট হিসাবে ৩৭.৫০ টাকা মাসিক বেতনে চাকরি পেলেন শম্ভুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সালটা ১৯৬৪। রংয়ের ভার্নিস করার কাজের পাশে চলত অন্যরকমের একটা ছোটো ব্যবসা— টাকা ধার দেওয়া, সুদ খাওয়ার কারবার। চালাতো বিহারীলাল মুরারকা-র এক আত্মীয় ও কোম্পানিরই একজন চিরঞ্জীব কেজরিওয়াল। শম্ভুপ্রসাদ দেখতেন আর শিখতেন। শিখতেন আর দেখতেন। কেজরিওয়াল মারা যাওয়ার পর, হলো বিপর্যয়। লোকের কাছ থেকে আর টাকা আসছে না, চালানো খুব মুশ্‌কিল হচ্ছে। ঠিক হলো এই টাকা ধার দেওয়ার কারবারটা বেচে দেওয়া হবে। কপাল ঠুকে এগিয়ে গেলেন শম্ভুপ্রসাদ, মালিকদের বললেন তিনি ওই ব্যাবসাটি কিনতে চান, দায়-ঝক্কি সব কিছুই নিয়ে। হাতে স্বর্গ হলেন মুরারকা-রা। বোকা বাঙালির বুদ্ধি দেখ!

১৯৮৬-তে শুরু হল সঞ্চিতা সেভিংস স্কিম প্রাইভেট লিমিটেড। টাইপিস্ট শম্ভুপ্রসাদ পরিণত হলেন মালিক শম্ভুপ্রসাদে। ঠিক তেমনি, আজকের অনেকেই। খুবই সাধারণ মানুষ হয়তো ছিলেন এঁরা— বুদ্ধি, সাহস ও বরাতের জোরে আজকে হয়ে উঠেছেন কেউকেটা। ফিরে যাওয়া যাক ইতিহাসে।

দায়ও যত, ঝক্কিও তত! মুরারকা কোম্পানি বেচে দিয়েছে শুনেই দ্বারস্থ হলো বহু লোক শম্ভুপ্রসাদের কাছে। আমরা টাকা দিয়েছিলাম, টাকা ফেরত চাই এক্‌খুনি। শুনলেন, বোঝালেন তাদের শম্ভুপ্রসাদ। এমনকি, শোনা যায় যে, ৫০,০০০ টাকা তিনি কোম্পানির ঘর থেকে নিয়ে খুব দুঃস্থ যে সব গ্রাহক তাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। বললেন, একটু সময় দিন, কোনো টাকা মার যাবে না, সব ফেরত পাবেন, কিন্তু একটু সময় দিন আমাকে।

জনগণ বুঝল। শুরু হলো যাত্রা সঞ্চিতার। প্রথম বছরে সঞ্চিতা বাৎসরিক ৭২ শতাংশ সুদে টাকা ধার নিল। অর্থাৎ, জনগণের কাছ থেকে যে টাকা তিনি পাবেন তা তিনি শোধ করার সময় ৭২ শতাংশ সুদ সমেত ফেরত দেবেন। এবং ফেরত দিতেন প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে। হৈ হৈ পড়ে গেল বাংলার ঘরে ঘরে। কোথায় লাগে ব্যাংক, পোস্ট অফিসরা? প্রথম বছর ১৯৭২-এই নাকি সঞ্চিতাতে জমা পড়েছিল ৫০ লক্ষ টাকা! তার পরের গল্প সবার জানা, যদিও বর্তমান প্রজন্মের কেউই প্রায় নাম শোনা ছাড়া আর কিছুই জানে না এই সম্বন্ধে। বাড়ল লোভ। নামানো হলো আরেকটা

কোম্পানি, অনির্বাণ চিটফান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। নতুন অফিস হলো ১/১ ভান্সিটার্ট রো-তে। ১৯৭৫-এ গঠন হলো জেমস রাজ কমিটি, চিটফান্ডদের কাণ্ডকারখানার খোঁজ লাগাতে। প্রমাদ গুণলেন শম্ভুপ্রসাদরা। পুরোনো চিটফান্ডগুলি গুটিয়ে, নতুন ভাবে নামা হলো মাঠে— চিটফান্ড নয়, সাধারণ বিনিয়োগ স্কিম নিয়ে। তৈরি হলো সঞ্চয়িতা ইনভেস্টমেন্টস। স্বপ্নের যাত্রাপথ। ততদিনে সুদের হার নামিয়ে এনেছে কোম্পানি। ৭২ শতাংশের বদলে বছরে ৪৮ শতাংশ করে দেবে ঠিক হলো। কিন্তু তাতে কী? ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার আম আদমি, এবং বাংলার বাইরে থেকেও। লোকে প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে ঢেলে দিল সঞ্চয়িতায় নির্দ্বিধায়। বাড়ির মহিলারা সোনার গহনা বিক্রি করে টাকা রাখল সঞ্চয়িতায়।

সূর্যদেবের একটা অমোঘ নিয়ম আছে। মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য, সেখানেই আটকে থাকে না। আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে পশ্চিমে এবং ক্রমে ক্রমে অস্ত যায় একেবারেই। সঞ্চয়িতার ব্যাপারেও তাই। রাজ্যসভার সদস্য রুডলফ রডরিগ্‌জ্‌-এর প্রথম চিঠি যায় ১৯৭৯ তে প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংয়ের কাছে। কালো টাকার ব্যাবসা চলছে নাকি সঞ্চয়িতায়? ১৯৮০-তে যুগান্তকারী বিস্ফোরণ ঘটালেন বাংলার অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র মশাই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমনকে লিখলেন কড়া চিঠি। শুরু হলো বিপর্যয়। উঠে গেল সঞ্চয়িতা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে।

তখনও মানুষ কেঁদেছিল হাউ হাউ করে। তখনও শম্ভুপ্রসাদ 'এজেন্ট'দের উদ্দেশ্যে একটি 'শেষ চিঠি' লিখেছিলেন। তখনও পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন শম্ভুপ্রসাদ। তখনও ধরা পড়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার একটি হোটেল থেকে ১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারি মাসে। তখনও দেদার টাকা খরচ করা হয়েছিল জমি কিনতে বিভিন্ন জায়গায়, ফ্ল্যাট কেনা হয়েছিল মুম্বাইয়ের জুহু তারা রোড থেকে কলকাতার ভিআইপি রোডে কৈখালির মোড় পর্যন্ত। 'ইস্ট কোস্ট' নাম দিয়ে কত নতুন কোম্পানি না খোলা হয়েছিল! তখনও নির্বাচনে চিটফান্ডের টাকা ঢুকেছিল দেদার। সেই অজুহাতই কোম্পানির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল যখন ৪৮ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশে সুদের হার কমানো হয়েছিল।

নাম, যশ ও অর্থ আসায়, আনুষঙ্গিক কিছু অনিবার্য দোষও দেখা দিয়েছিল। এল মহিলা, এল ছোটো-বড়ো নানান চিত্রাভিনেতা। সঞ্চয়িতার টাকা তখন ঢুকেছে সিনেমাতে, টলিউড ও বলিউডে। শোনা যায়, রাজেশ খান্না-রাখীর 'আঁচল' থেকে 'সান', 'নসীব', 'খুদ্দার', 'খানদান' 'আন্দাজ', এমনকি 'শোলে' তৈরিতে টাকা ছিল সঞ্চয়িতার। শম্ভুপ্রসাদও মার্সেডেজ কিনলেন।

আর আজ ২০১৩। তফাত ৩০ বছরের! কি-রকম চেনা চেনা লাগছে না অনেক কিছু এবার? আগে কি কোথাও এরকম সিনেমা দেখেছেন? মনে পড়ছে না? *বেবি'জ ডে আউট*। গল্পের বইয়ের সব কিছু যেন মিলে যেতে থাকল 'বেবির' জীবনে। শুধু পার্থক্য এই যে সঞ্চয়িতাও ছিল বাস্তব, সারদাও তাই। বছর গড়ায়, চরিত্রগুলি বদলায়, কিন্তু ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই। যাক গে! সবই মায়ের ইচ্ছে! সঞ্চয়িতা কাণ্ডে সঞ্চয় করতে গিয়ে মরেছিল বাঙালি, আর এবার তো... জয় মা! মা-গো মঙ্গল কর মাটি ও মানুষের।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *এই সময়*, ২৯ এপ্রিল ২০১৩।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের কড়াইয়ের বাচ্চা কিংবা 'সারদা'-র গণেশ

৭ পাতার পর

মেরে দেওয়া হলো। সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ যে নেই তা নয়, তবে নিম্ন-আয়ের মানুষজনই সংখ্যায় অনেক-অনেক বেশি। সারদার মতো অজস্র ঠগ কোম্পানি সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একাজ করছে আর এদের প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সহায় হয়েছে শাসক-বিরোধী সব ধরণের রাজনৈতিক দলের হরেককিসিমের নেতা-নেত্রী, সাংসদ, মন্ত্রী, মায় আপাত-অরাজনৈতিক ফুটবল ক্রিকেট দল, নানান সংবাদ মাধ্যম, এক কথায় সমাজের একেবারে উপর তলার কতিপয় মধ্যস্বত্ব ভোগী ফড়ে-দালাল। এদের ক্ষমতার হাত এতটাই বিস্তৃত যে অর্থ-হারানো এই মানুষেরা এদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। থানা-পুলিশ-কমিশন-সভা-সমাবেশের চাপান-উতোরের নাটক অবশ্য চলবে কিছুদিন, কারণ সামনে পর পর পঞ্চায়েত, লোকসভা নির্বাচন আসছে। অন্যদিকে আর একদল ডাঙায় বসে বারে বারে 'ওদের লোভের ফল' বলে কোলের ঝোল ঠেলে দিতে চাইছে ওই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির দিকেই। অথচ বহু বহু বছর ধরে আজ পর্যন্ত নীচের তলার ওই মানুষেরা তাদের শরীর নিঙড়ানো শ্রম বেচেও যে ন্যূনতম সুরক্ষা কিনতে পারেনি, কোনো আশার মুখ কখনও দেখতে পায় নি, তাদের সামনে কোনো আইনী রক্ষাকবচ ছাড়া এই ধরণের ঠগ-জোচ্চোর কোম্পানিকে কাঁচা টাকা তোলার ব্যাবসা করতে দেওয়া হলো, নেতা-মন্ত্রীরা ওই ঠগদের সভায় দাঁড়িয়ে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে দিল, পরোক্ষে মানুষকে অর্থ লগ্নি করার প্ররোচনা দেওয়া হলো, এসবই হলো এদের নির্দোষ কাজকম্মো। দোষ হলো ওই 'হতভাগা' হতভাগ্যদের— অতি সহজেই স্বল্প-আয়াসে বড়োলোক হতে চাইছিল যে ওরা! এমনকি কেন অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি, কেন দেখেশুনে লগ্নি করেনি বলেও অনেকে চিৎকার করছে। অথচ নির্দ্বিধায় কয়েকজন মন্ত্রী, সাংসদ, চাটুকার সাংবাদিক সারদা-র লাভের গুড় খেয়েও ক্রমাগতই বলে চলেছে— 'সারদা যে চিটফান্ড সে আমরা কী করে জানব!' যেন এটা তো জানার কথা আম-জনতার, নেতারা কেন জানতে যাবেন! যাক গে, কথায় কথা বাড়ে।

রাতারাতি সুদীপ্ত সেন নামের এক জোচ্চোর বাঙালির পয়লা বৈশাখের হালখাতার খাতায় কালি লেপটে ভূত করে দিয়েছে। এমন আরও অনেক ঠগ অচিরেই এ-রাজ্যের অনেক মানুষকেই গান্ধী-ইউনিফর্ম পরিয়ে যে ছেড়ে দেবেন তাতে কোনো ব্যত্যয় নেই। অপাতত আম-বাঙালির অযৌক্তিক বিশ্বাস আর অলীক আশা শেষ পর্যন্ত যে ঘাটে গিয়ে ঠেকার কথা সেখানেই ঠেকেছে!

মোল্লার যে কথাটা শেষে বলব বলেছিলাম, সেই কথাতেই ফিরি।

—'ভাই বড়ো কষ্টে আমি তোমার কাছে আসতে পারছিলাম না। তোমাকে বলতেও আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! হলো কী, তোমার কড়াইটা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দু'দিন পরেই সেটা মরে গেল। ভাবছিলাম কড়াইটার ''চল্লিশা'' সেরেই তোমাকে জানাব। কিন্তু তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়বে জেনে আমি আর থাকতে পারলাম না— তাই জানাতে এলাম।'

— মুর্খ, কি যা তা বলছ? লোহার কড়াই মারা যাবে কি করে?'— পড়শি চিৎকার করে উঠল।

— 'কেন, কড়াই যদি বাচ্চা দিতে পারে তাহলে মরে যেতে পারবে না কেন?'— বলেই মোল্লা পিঠটান দিল।□

এক সফল সমবায়ের গল্প

রীতা রায়, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

ঊষা কো-অপারেটিভ। ১৯৯৫ সালের ২১ জুন যাত্রা শুরু। তারপরের ১৮ বছর এক উত্থানের ইতিহাস। আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতই নয়, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় প্রথম যৌনকর্মীদের সফল কো-অপারেটিভ বলে চিহ্নিত ঊষা কো-অপারেটিভ।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে সমবায়। ঊষা কো অপারেটিভও এরকমই এক সমবায় যার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ। যৌনকর্মীদের আর্থনীতিক উন্নয়নে এবং সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে ঊষা কো অপারেটিভ সেই বিশেষ ভূমিকাটি পালন করে আসছে। যা তাকে এই ঐতিহাসিক খ্যাতির দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে। এই ইতিহাস, এই সাফল্যের ইতিহাসটা বুঝতে তাই আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে।

১৯৯২ সালে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় সোনাগাছি এলাকায় যৌনস্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজ শুরু করে। সাধারণ যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তখন একদল শিক্ষণপ্রাপ্ত যৌনকর্মী এলাকার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এড্‌স সহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে বোঝাতে থাকেন। সেই সময় তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে, প্রয়োজন শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতাই নয়, নিজেদের অর্থনৈতিক সুরক্ষাটিকেও মজবুত করে তুলতে না পারলে কোনো সমস্যারই সমাধান সহজে সম্ভব নয়। ১৯৯৫ পূর্ববর্তী সময়ে তাদের অভিজ্ঞতা হলো অভাব অনটনের সময় কিস্তিওয়ালা, চটাওয়ালাদের কাছে ঋণ নেওয়া আর সেই ঋণের সুদ গুণতে গুণতেই প্রায় পথে বসার উপক্রম হওয়া। এই অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ তখন আর কোনো বিষয়েই উৎসাহ পান না, আগ্রহ দেখান না।

এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করেই দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সদস্যদের ও ড. স্মরজিৎ জানা-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঊষা মাল্টিপারপাস্ কো অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সব কিছু নিয়মমাফিক শুরু হলেও ধাক্কা লাগল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আইনে-র আইনী স্বীকৃতি পেতে গিয়ে। এক তো আমলাতান্ত্রিক হয়রানি, তারপর প্রশ্ন উঠল যৌনকর্মীদের 'চরিত্র' সম্পর্কে। টানাপোড়েন চলল বেশ কিছুকাল। তবে সব সময় কিছু লোক থাকেন যাদের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে অন্তত খানিকটা দুর এগোনো যায়। আসলে 'চরিত্র' শব্দটিই যে আপেক্ষিক, সেদিন এই যুক্তিটিই তোলা হয়েছিল। খানিকটা কাজও হয়েছিল এতে। সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল সমবায় দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রী মাননীয় সরল দেবের। ঊষা কো-অপারেটিভ আইনের স্বীকৃতি পেয়েছিল। দিনটা ছিল ২১ জুন, ১৯৯৫ সাল।

সমবায় আবশ্যিক ভাবে 'সদস্য কেন্দ্রিক' প্রতিষ্ঠান। নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনে সদস্যরাই সমবায় সমিতি গঠন করেন। কিন্তু সমিতি গঠনই শেষ কথা নয়। সমিতির উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন কাজকর্মে প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রত্যেক সদস্যকে মনে রাখতে হবে তিনি সমিতির একজন মালিক এবং একই সঙ্গে সেবা ব্যবহারকারীদের একজনও বটে। এর ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সমবায়ের প্রতি মমত্ববোধ, বাড়ে দায়বদ্ধতা, দৃঢ় হয় সামাজিক বন্ধন। এই সবেরই দৃষ্টান্ত একসঙ্গে মিলেছে ঊষায়।

ঊষা কো-অপারেটিভ প্রথমে কলকাতা ও হাওড়ার পৌর এলাকায় কাজ করার অধিকার পায়। ২০০৯ সালে আরও ৪টি জেলা (উত্তর ও ২৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ) অর্থাৎ মোট ৬টি জেলায় কাজের অধিকার পায়। ২০০১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রান্তের যৌনকর্মীরা চাইছিলেন ঊষার ছত্রছায়ায় আসতে। সেই মতো ঊষা সমবায় মন্ত্রীর কাছে আবেদনও জানায়। দীর্ঘ আলাপচারিতার পর অবশেষে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সমবায় মন্ত্রী রবীন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত যৌনপল্লী এলাকায় ঊষা কো-অপারেটিভের কাজ করার অনুমোদন দেন। এখন ঊষার পরিষেবা পৌঁছে গেছে সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত যৌনপল্লী এলাকায়। কথাটা যে কথার কথা নয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৯৯৫-৯৬ সালে শুরুর বছরে ঊষার সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৪ জন আর আজ এই ২০১৩ সালে তার সদস্য সংখ্যা ১৯,৭২২ জন। মূলত যে ভরসা, যে নিশ্চয়তা প্রান্তে থাকা মানুষ আশা করেন ব্যতিক্রমহীন ভাবে সে আশা পূরণের সামর্থ্য ঊষা অর্জন করতে পেরেছিল সেদিন, এবং তা আজও

ধরে রাখতে পারছে, নিঃসন্দেহে সে-কথা বলা যায়।

উষা কো-অপারেটিভ ব্যাংক আজ তাই যৌনকর্মীদের নিজস্ব ব্যাংক। অথচ একটা সময় ছিল যখন কোনো ব্যাংকেই একজন যৌনকর্মীর টাকা রাখার অধিকার ছিল না। ফলে তাদের সারা জীবনে যা কিছু অর্জন তা এমন জিম্মায় রাখতে বাধ্য হতেন, যা প্রয়োজনের সময় তারা প্রায়শই কাজে লাগাতে পারতেন না। আজ তারা অনেকেই সে-সমস্যা মুক্ত। একদিকে তাদের টাকা নিজের নামে সুরক্ষিত থাকা ছাড়াও তারা সহজেই ঋণ পেতে পারেন উষা কো-অপরেটিভ ব্যাংক থেকে। এ-ব্যাপারে উষার বিভিন্ন প্রকল্প আছে। যেমন ১. সেভিংস ডিপোজিট : এই প্রকল্পে সদস্যা টাকা রাখেন তাঁর সাধ্যমতো। প্রয়োজনে টাকা তুলতে পারেন। টাকা তোলার সময় ২০০ টাকা জমা রেখে বাকি টাকা তোলা যায়। এই প্রকল্পে সুদ বার্ষিক ৫ শতাংশ। ২. থ্রিফট ফান্ড : প্রতি মাসে কমপক্ষে ৫০ টাকা বা তার গুণিতকে টাকা রাখা হয়। টাকা যখন ইচ্ছা তোলা যায় না। যখন সদস্যা বই বন্ধ করে দেন তখন সমস্ত টাকা ফেরত পান। এই প্রকল্প থেকে জমা টাকার ১০০ শতাংশ লোন পাওয়া যায়। প্রকল্পে সুদের হার বার্ষিক ৭ শতাংশ। ৩. রেকারিং ডিপোজিট : প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে ৫০ টাকা বা তার গুণিতকে টাকা জমা করতে হয়। বছরের শেষে সুদ সমেত টাকা পাওয়া যায়। এই প্রকল্পে সুদের হার বার্ষিক ৯.০৬ শতাংশ। ৪. মাসিক আয় প্রকল্প : এই প্রকল্পে কমপক্ষে ৫০০০ টাকা এবং পরে ১০০০ টাকার গুণিতকে টাকা জমা রাখতে হয়। মেয়াদ ৫ বছর। বার্ষিক সুদের হার ৮ শতাংশ। ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি টাকা জমা দিলে সুদের হার বার্ষিক ৯.২৫ শতাংশ। ৫. স্থায়ী জমা প্রকল্প : বিভিন্ন মেয়াদের হয়। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একসঙ্গে জমা রেখে নির্দিষ্ট সময় পর সুদসমেত ফেরত পাওয়া যায়। টাকা দ্বিগুণ হতে সময় লাগে ৮ বছর ৫ মাস। ৬. দৈনিক জমা প্রকল্প : এই প্রকল্পটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাই সদস্যাদের সুবিধার কথা ভেবে সুদের হার বার্ষিক ১০.১১ শতাংশ। সুদের হার অন্যান্য ব্যাংক বা সংস্থার চেয়ে অনেক বেশি। সদস্যাকে মনে রাখতে হবে এটি একটি দৈনিক সঞ্চয়ের এক বছরের প্রকল্প। সুতরাং ১ বছরের মধ্যে স্কিম অনুযায়ী নিয়মিত ভাবে টাকা জমাতে হবে এবং সম্পূর্ণ করতে হবে। কোনো কারণে একটানা ১৫ দিনের বেশি এই প্রকল্পে টাকা জমা না করলে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাবে। ওই সময় পর্যন্ত যা জমেছে সেই জমা টাকা ও কিছু সুদ পাওয়া যাবে। মাঝপথে বন্ধ হওয়া প্রকল্পে সুদের হার অবশ্যই অনেক কম হবে। ৭. সহজে ঋণ নেবার সুবিধা : সদস্যরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, নিজেদের স্বাস্থ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরির জন্যে লোন নেন। স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লোনের ব্যবস্থা আছে। স্বল্পমেয়াদি ১ বছরে মধ্যমেয়াদি ৩ বছরে ও দীর্ঘমেয়াদি ৫ বছরে পরিযোধযোগ্য। ঋণে আসল টাকার উপর ১১ শতাংশ সরল সুদের হারে সুদ নেওয়া হয়। আসল টাকা কমলে সুদ কমতে থাকে। এই সমস্ত প্রকল্পেই আজ যৌনকর্মীরা ভিড় করেন নিজে, নিজের পরিবারকে বাঁচানোর তাগিদে। উষার সাফল্যের তালিকায় আরও অনেক অনেক কিছুই আছে, তার সামান্য পরিচয় এখানে তুলে ধরাই যায়।

সারণি

উষা কো-অপারেটিভের সদস্যা	
১৯৯৫-৯৬	৯৪ জন
১৯৯৬-৯৭	১০৪ জন
১৯৯৭-৯৮	২১৪ জন
১৯৯৮-৯৯	৪৮৩ জন
১৯৯৯-২০০০	১৮০১ জন
২০০০-০১	২২১৯ জন
২০০১-০২	২৭১২ জন
২০০২-০৩	৭৭১ জন
২০০৩-০৪	৭২৪২ জন
২০০৫-০৬	৮০৮৪ জন
২০০৬-০৭	৯২৪২ জন
২০০৭-০৮	১০০১৬ জন
২০০৮-০৯	১০৭২০ জন
২০০৯-১০	১৩০০০জন
২০১০-১১	১৪২৯৫ জন
২০১১-১২	১৪৭৪৮ জন
২০১২-১৩	১৯৭২২ জন

সামাজিক বিপনন

বিভিন্ন ধরণের যৌনরোগ হওয়ার সম্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেতে যৌনকর্মীদের পেশায় কন্ডোম ব্যবহার একান্ত জরুরি। তারা বাইরের দোকান থেকে কন্ডোম কিনে অনেক সময় ঠকেন। তাই সুলভে ও সঠিক মানের কন্ডোম বিক্রি করার জন্যে উষা কো-অপারেটিভ কন্ডোমের সামাজিক বিপননের ব্যবস্থা শুরু করে। আজ শুধু কলকাতা নয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যৌনকর্মীরাও উষা কো-অপারেটিভের কন্ডোম ব্যবহার করেন। বর্তমানে উষা কো-অপারেটিভ যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন এরকম বহু সংস্থাকেও কন্ডোম বিক্রি করছে। ২. স্টেশনারি ব্যবসা : বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে উষা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি দ্রব্যের ব্যবসা চালাচ্ছে। ৩. ট্যুর ও ট্রাভেলস : উষা কো-অপারেটিভের আর এক সফল প্রয়াস। ট্যুর ও ট্রাভেলসের মাধ্যমে সকল লোকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া ও আর্থিক ভাবে কো-অপরেটিভকে আরও শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই মূল লক্ষ্য। ৪. ন্যাপকিন ব্যবসা : কন্ডোমের মতোই আর একটি প্রকল্প। মেয়েদের ন্যাপকিন তৈরি করতে শেখানো এবং তারা নিজেরাই কাজ শিখে যাতে স্বচ্ছল হয়ে উঠতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রকল্পের সূত্রপাত। এছাড়া যৌনকর্মীর সন্তান-সন্ততিদেরও এই কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উপযোগী পথ করে দেওয়াই এই প্রকল্পের

সারণি

প্রতি বছরে আমানত বৃদ্ধি
(লাখ টাকার হিসাবে)

বছর	আমানত
১৯৯৫-৯৬	৩ লাখ
১৯৯৬-৯৭	১৫ লাখ
১৯৯৭-৯৮	১৭.৫ লাখ
১৯৯৮-৯৯	২০ লাখ
১৯৯৯-২০০০	৪০ লাখ
২০০০-০১	১৫০ লাখ
২০০১-০২	১৮০ লাখ
২০০২- ০৩	৩৫০ লাখ
২০০৩-০৪	৫২৫ লাখ
২০০৪-০৫	৮০০ লাখ
২০০৫-০৬	৯০০ লাখ
২০০৭-০৮	১০৭৫ লাখ
২০০৮-০৯	১২০০ লাখ
২০০৯-১০	১২৭৫ লাখ
২০১০-১১	১৩৭৫ লাখ
২০১১-১২	১৫০০ লাখ
২০১২-১৩	১৬২৫ লাখ

অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়াও আছে প্রসাধনী ব্যবসা, কৃষি উৎপাদন ও বিপনন, পশুপালন ও মৎস চাষ, বারুইপুরে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ ও তা কাজে লাগিয়ে উষার আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।

সীমান্তবর্তী মানুষের সামাজিক সুরক্ষা

ঊষা যৌনকর্মী ছাড়াও অন্যান্য সীমান্তবর্তী মানুষদের জন্যে কাজ করে চলেছে। দুর্বারের অন্যতম সংস্থা মমতা কেয়ার ও ট্রিটমেন্ট সেন্টার-এর পজিটিভ লোকদের জন্যে বেশ কয়েকবছর আর্থিক অনুদান দিয়েছে। এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নতির জন্যে কাজ করে চলেছে, যেমন গৃহশ্রমিকদের সমবায় গঠনে সহযোগিতা করা।

ঊষার প্রসার একটা লক্ষণীয় মাত্রায় বাড়লেও পরিচালকরা লক্ষ্য করছিলেন যে গত কয়েকটা বছরে আমানতের ঊর্ধ্বগতিতে সামান্য হলেও ভাটা পড়ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বহু যৌনকর্মী বেশি লাভের আশায় ঊষার পাশাপাশি বিভিন্ন চিটফান্ডে টাকা রাখছেন। সাধারণ ভাবে চিটফান্ডের কাজকর্ম ও আর আগের ইতিহাস থেকে পাওয়া শিক্ষার কারণে নানানভাবে আমানতকারীদের সচেতন করা হয়। তবে তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। কারণ এই সব চিট ফান্ড কোম্পানি যে ভাবে, যেমন খুশি বুঝিয়ে এবং মোটা টাকার ফেরৎ মূল্যের লোভ দেখিয়ে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছিল তাতে সহজেই প্রলোভিত হওয়ার বহু উপাদান ছিল। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে ঘটে যাওয়া চিটফান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সারদা কোম্পানির বৃহৎ কেলেঙ্কারির পর সেটা তো জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ঘটনায় এই রাজ্যের অনেকেই হতবাক হয়েছেন, এটা সত্যি হলেও এতে অবাক হওয়ার একদমই কোনো কারণই নেই। এই জাতীয় ভুঁইফোঁড় অর্থলগ্নিকারী সংস্থার ইতিহাস তাই বলে, এখনও সঞ্চিতা সঞ্চয়িতার কথা বোধহয় সবাই ভুলে জাননি। তবু দুঃখ হয়, ক্ষোভ হয়, বহু শ্রমজীবী মানুষের, এমনকি যৌনকর্মীদেরও বহু কষ্টে উপার্জিত টাকা সম্পূর্ণ জলে গেল বলে। আর ক্ষোভ আজ সারা পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ জন-মানুষের। তবে যৌনকর্মীদের এই ক্ষতির ব্যাপারে উষার সাবধান বাণী এখনও যৌনপল্লির মানুষ মনে করতে পারেন, সেই ইতিহাসটা সংক্ষেপে জানালে বোধহয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

২০০৮ সালের শেষের দিক থেকে হঠাৎই ঊষার পরিচালকরা জানতে পারেন যে এলাকায় চিটফান্ডের দৌরাত্ম্য বাড়ছে এবং উষার আমানত সংগ্রহকারীরাও তাতে জড়িয়ে যাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে তারা দেখেন যে, উষার আমানত সংগ্রহকারীরা সংগ্রহের উপর যে কমিশন পান তার থেকে বেশি কমিশন দিচ্ছে অন্যান্য ভুঁইফোঁড় চিটফান্ড সংস্থা এবং এর পরিমাণ শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ।

এই সব অঞ্চলে তখন প্রচার শুরু করল ঊষা। এলাকার সব রাজনৈতিক দলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হলো। এমনকি চিটফান্ড এবং সমবায়ের বিষয়টি নিয়ে একটি আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হলো। আশ্চর্যের বিষয় হলো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী ওই আলোচনা চক্রে যোগ দিলেন না। এলাকার বিধায়ক ড. শশী পাঁজার সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনার সময় তিনি উষাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও কার্যক্ষেত্রে তাকে পাওয়া যায়নি। উষা চিঠি দিয়ে জানাল সমবায় দপ্তরে, জানাল ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নিতে ওঁরা অপারগ, সে-কথা প্রায় সরাসরিই জানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য উষা তার নিজের প্রচারে জোর দিক বলে অনেক উপদেশও দিলেন। ব্যবস্থা হিসেবে উষা সেবির নির্দেশিকাও প্রচারের ব্যবস্থা করল। এমনকি এলাকার কয়েকজন সাধারণ যৌনকর্মী চিটফান্ড বিষয়ে বড়তলা থানায় নালিশ জানাতে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সারদা-র এজেন্টদের ডেকে পাঠিয়ে কথা বলবেন বলে জানালেন। পরে থানা থেকে ওই যৌনকর্মীদের জানানো হয়, সারদার এজেন্টরা থানায় জানিয়েছে যে, শর্ত অনুযায়ী যথা সময়ে অর্থাৎ ১৫ মাস পরে টাকা ফেরৎ পাবে, যদি ১৫ মাস পরে টাকা ফেরত না পান তখন যেন তারা জানান। দেখা গেল চিট ফান্ডের ব্যাপারে থানাও কোনো কথার গুরুত্ব দিল না। এ-সময় ঊষা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল বটে কিন্তু প্রচার সে পূর্ণোদ্যমে বজায় রেখেছিল। ইতিমধ্যে উষার যে সমস্ত আমানত সংগ্রহকারীরা গোপনে চিটফান্ডের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন উষা তাদের বহিষ্কার করে। এমনকি তাদের ছবি দিয়ে স্থানীয় কেবল টিভিতে প্রচার করে দেয় যে, ওদের সঙ্গে ঊষার কোনো সম্পর্ক নেই।

উষা সে-সময়ে বুঝতে পেরেছিল যে, উষার বহিষ্কৃত আমানত সংগ্রহকারীরা তার সুনাম কাজে লাগিয়ে যৌনকর্মীদের প্ররোচিত করছে, প্রচার করছে ঊষা থাকবে না বলে। তবে অল্পদিনেই ধর্মের কল বাতাস নাড়িয়ে দিয়ে গেলেও সর্বনাশ যা হওয়ার ছিল ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। এখন অনেকেই বুঝতে পেরেছেন তারা চিটফান্ডের কবলে পড়েছিলেন কিন্তু আজ আর কিছু করার নেই। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন তাই বলছেন : যা করে ফেলেছি ফেলেছি, ভবিষ্যতে আর নয়। তবে শেষপর্যন্ত দেখি টাকা পাই কি না। ওরাও তো এলাকার ছেলে-মেয়ে টাকা যদি বার করে এনে দিতে পারে। ঊষায় ওদের অনেকদিন ধরে দেখেছি। আসলে এত বেশি সুদের লোভ সামলাতে পারিনি।

ঘটনার পর এখন দেখা যাচ্ছে লোভের বশে সোনাগাছি এলাকায় শুধু যৌনকর্মীরাই নয়, যৌনকর্মীর বাবু, দালাল, বাড়ির কাজের লোক ছেলে-মেয়ে সবাই এই সব ভুয়ো সংস্থায় অর্থ লগ্নি করেছে। মোট বিনিয়োগ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে। হতাশায় ভেঙে পড়েছেন এলাকার অনেকেই। ক্ষোভ বাড়ছে দিন দিন। ইতিমধ্যে উষাও চেষ্টা শুরু করেছে যাতে নতুন কেউ এই চিটফান্ডের কবলে না পড়েন। ঊষা একসময় এলাকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্য সংস্থার কাছে ঈর্ষার বিষয় ছিল এই ঘটনার পর তাকেই আরও পোক্ত করতে চায়।

এখন উষার আবেদন, শুধু সারদা নয় অন্যান্য চিটফান্ডও একইরকম দুর্দশা বয়ে আনবে। তাই সকল রাজনৈতিক দলের কাছে ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে উষার আবেদন : উষা চিটফান্ডের বিরুদ্ধে প্রচারের সমস্ত ব্যবস্থা করবে, সকলে শুধু ওই প্রচার মঞ্চে উষার সঙ্গে থাকুন। সকলে মিলে চিটফান্ডের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে প্রচারের সীমা শুধু যৌনকর্মীদের পল্লিতেই আটকে না রেখে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করতে হবে। ঊষা এ-ব্যাপারে বৃহৎ এক গণ আন্দোলনে সকলকে সামিল করতে চাইছে।

উষা চাইছে যৌনকর্মী ছাড়াও একান্ত গরিব, সহায়সম্বলহীন মানুষের যে টাকা গেছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সবরকমের সহযোগিতা করা। এলাকার এজেন্ট বা এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে বসে সমস্যার সমাধান করা ও আইনি সাহায্য দেওয়া। সরকার যে আইন প্রণয়ন করছে সে আইন আইনের পথে চলুক কিন্তু সে আইন প্রণয়নের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য চিটফান্ডগুলো যাতে ধাপ্পা দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও টাকা ফেরত চাওয়ার ব্যবস্থা করা।

কাজটা উষা ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। □

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি-রাজনীতি : ছয় দশক

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে ছয় দশক কেটে গেল, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার সেই অর্থে পুনরুজ্জীবন ঘটল না। সেই অর্থে বলতে স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে এই রাজ্য গোটা দেশের নিরিখে যেখানে ছিল সেই অবস্থাটা আজও ফিরিয়ে আনা গেল না। ফিরে না আসার কারণ বহু। অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেক কারণই সরকারি ভাবে জানা, স্বীকার করেছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দলের সরকার। অনেক তথ্য নিয়ে আজও বিতর্ক বিতন্ডা চলে। কিন্তু পাওয়া যায় না সেই অর্থে কোনো সদর্থক প্রচেষ্টা যাতে এই রাজ্য আবার দেশের অর্থনীতির মানচিত্রে উজ্জ্বলতম স্থানটি অধিকার করতে পারে।

কেন? এই প্রশ্নের আলোচনার আগে দেখে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে এই রাজ্যের অবনতি ঘটে চলেছে। কীভাবে সময়ে সময়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে মোড় ঘোরানোর চেষ্টা হয়েছে। মোড় ঘোরে নি। তবু কীভাবে আজ টিকে আছে বাঙালি। রাজ্যের অর্থনীতির এই গতি-প্রকৃতি স্পষ্ট হলে আগামী দিনের একটা পূর্বাভাসও পাওয়া সম্ভব।

স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে একটা জোয়ার ছিল। কৃষি-শিল্পের উৎপাদন- শীলতার নিরিখে এই রাজ্য তখন ছিল সর্বভারতীয় নিরিখে উপরের দিকে। তারপর থেকেই ক্রমশ কমতে থাকে এ রাজ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ। ফলে ভাটা পড়তে থাকে অগ্রগতিতে। কেন, কিভাবে উত্তর খুঁজব।

মোট জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি মাপকাঠি আছে— কতটা এগোনো যাচ্ছে আর কত কর্মসংস্থান হচ্ছে। এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য থাকলে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য কমতে থাকে। নইলে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নয়নের সুফল সাধারণ রাজ্যবাসী পায় না। আসল কথা অধিকাংশ মানুষের ভালো থাকা। তাই সবার হাতে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যে যদি কোনো অর্থনীতিকে সাজানো হয় তাহলে সেই অর্থনীতি ঠিকঠাক আছে বলা যায়। মুশ্‌কিলটা হলো : অর্থনীতির মূল উপাদানগুলো যে প্রাণীর আয়ত্তে থাকে তারা তাদের উন্নতির লক্ষ্যে অর্থনীতিকে সাজাতে চায়। সেই হিসেবেই তাদের মূল দাবিগুলি কার্যকর করার জন্য রাজনীতিকে চালনা করার চেষ্টা হয়। এ রাজ্যেও তাই হয়েছে। এ রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তিটা এখনও কৃষিতে। কৃষিতে জমিই প্রধান উপাদান। জমি যার হাতে সেই শ্রেণি চেষ্টা করছে তাদের মতো করে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ভালো থাকতে। রাজনীতির লোকেরা এই ভোটাভুটির দেশে মানুষের ভালো থাকা বলতে বেশির ভাগ মানুষের কথা ভাবে না। যে শ্রেণির প্রভাবে ভোটে রায় নির্দ্ধারিত হয় সেই শ্রেণির ভালো মন্দই মূল বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনীতিকেও সেই হিসেবে সাজাতে নীতি নেওয়া হয়। এ রাজ্যের অর্থনীতির পিছনে সেই প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকাও তাই বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। তারা কখনও জমিদার, জোতদার, কখনও জমিহারা বর্গাদার। সময়ের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে যারা যখন ভোটের বাক্সে বড়ো ফ্যাক্টর হয়েছে, অর্থনীতিকেও সেই দিকে ঘোরানো হয়েছে। সার্বিক ও সামগ্রিক উন্নয়নের কৃষি তাই কোনো দিনই ছিল না। যদিও এই সময়ের মধ্যে যতগুলি সরকার ক্ষমতায় থেকেছে তারা সকলেই দাবি করেছে যে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নতিতে তাদের সরকার কাজ করেছে। এই দাবির বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস গ্রামে এবং তারা নিযুক্ত কৃষিতে। তাহলে কৃষির উন্নতি হতো। রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অংশ বেড়েই চলত। তা হয় নি। না হওয়ার কারণ অনেক। সেসব নিয়ে আলোচনায় আসার আগে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন---গ্রামোন্নয়ন বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির পরিমাণ বাড়ানোর মতো দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। এর জন্য দায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি পুঁজিবাদী অভিমত। সেটি হলো : মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান যত কম হবে সেই দেশ বা রাজ্য ততই এগোবে। পুঁজি চায় মুনাফা। মুনাফার হার বাড়ে না কৃষিতে। তার চাইতে অন্য ক্ষেত্রে যেখানে যত দ্রুত পুঁজি বাড়বে সেই সব ক্ষেত্রের বিকাশের হার বাড়লে অর্থনীতি ততই এগোবে। পুঁজির পৃষ্ঠপোষণা করতে গিয়ে যথারীতি এই দিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষিকে উপেক্ষা করা হয়। লক্ষ্য হয়ে ওঠে শিল্প ও পরিবেশ ক্ষেত্রের বিকাশ। চেষ্টা করা হয় কর্মসংস্থানও যেন সেইখানেই বেশি হয়। দুঃখের কথা, গোটা ভারতেও তা হয়নি। এ রাজ্যেও তা হয় নি। অর্থাৎ পুঁজির কথা ভেবে, উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির দর্শনকে সামনে রেখে চলতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষিকে দেওয়া হয়েছে কম গুরুত্ব। অন্তত গত দু'দশকে তাই-ই ঘটেছে।

কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ে নি সেই মতো। ফলে কৃষিতে চাপটা রয়েই গেছে শুধু নয়, একদিকে কমেছে তার উৎপাদনশীলতা অন্যদিকে তাকে বইতে হয়েছে বেকারত্বের চাপ। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যেত কৃষিকে যদি নিদেনপক্ষে সরকারি ভাবে কৃষির পরিকাঠামোয়, উৎপাদনে, বিপণনে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ত। বাড়ানো হতো ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের উন্নতিতে নেওয়া আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে সরকারি বরাদ্দ। কোনোটাই হয়নি। সারা ভারতের সঙ্গে এই ব্যাপারে এ-রাজ্যেও গত চার দশক ধরে একই ট্রাডিশনই চলেছে। ফলে কৃষিতে অবনতি অনিবার্য হয়েছে। কৃষকের নাভিশ্বাস উঠছে। ধুঁকেছে রাজ্যের গোটা অর্থনীতি। না ঘটেছে বিকেন্দ্রীকরণ, না গড়ে উঠেছে আত্মনির্ভরশীলতা। এমত অবস্থায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে বাঙালি।

গত পাঁচ দশকে এ রাজ্যের কৃষি এগিয়েছে দোলাচলের মধ্যে দিয়ে। এগোনো পিছানো আর স্থিতবস্থার সারণি বেয়ে সেটা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে এখনই এ নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে রাজ্যে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। কারণ অনেক। সবচেয়ে বড়ো কারণ সরকারি নীতি ও উদ্যোগহীনতা। উদ্যোগহীনতাও এখন একটা যেন নীতিতে পর্যবসিত হচ্ছে, বিশেষত এই উদারনীতির যুগে। বেসরকারিকরণ করতে করতে গোটা কৃষিক্ষেত্রে ছোটো ও ভূমিহীন প্রান্তিক চাষিরা শেষপর্যন্ত কর্পোরেট কৃষি সংস্থার কৃষক কর্মী না হয়ে যান। তা কীভাবে হতে চলেছে, কীভাবে খাদ্য সংকট আসতে পারে তা নিয়ে আলোচনার আগে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতটা বোঝার জন্যই আমাদের কয়েক দশক পিছিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবাংলায় মাথাপিছু চাষের জমি চিরকালই কম। বাকি ভারতের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। কিন্তু জমির উর্বরতা এতটাই বেশি যে উৎপাদন ক্ষমতায় তা দ্বিগুণেরও বেশি। ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল বেশি। স্বাধীনতার সময়ে গোটা ভারতে এ রাজ্যেই মাথাপিছু খাদ্যশস্য পাওয়া যেত সবথেকে বেশি। দৈনিক ৩৮১ গ্রাম। বাকি ভারতে ৩৩৪ গ্রাম। স্বাধীনতার পর কিন্তু ছবিটা ওলটাতে শুরু করল। বাকি ভারতে মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়তে থাকল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই এই উলটপুরাণ শুরু। নয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত টানা প্রায় চার দশকের ছবিটা এইরকম।

১৯৯০ সাল থেকে এ রাজ্যে ফের মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়তে থাকে। এর পরের বিশ বছর সময়টা উদারনীতির। নানা পরিবর্তনের সময়। এই সময়টা নিয়ে আলাদা করে বলতে হয়।

এদেশে স্বাধীনতার প্রথম দিকে, বিশেষত প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে জাতীয় স্তরে কোনো কৃষিনীতি সরকারি ভাবে গৃহীত হয় নি, তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সরকার এই নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। উদ্যোগ ছিল কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার, কিন্তু তার নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিকই ছিল। তবে ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট দিশা ও কর্মসূচি। এই একই ঘটনা দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। এই সময়ে কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে। তবে বৃদ্ধির হার নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন বৃদ্ধি হয়েছে, তবে মন্থর গতিতে সেই হার কমে আসছিল। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন ড. অশোক মিত্র। তিনি ওই বছর *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় (১৪-১৫ অক্টোবর) লেখেন, ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছিল ৩.২ শতাংশ হারে। অথচ ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ০.৬৭ শতাংশ হারে। দুই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক শ্রীনিবাসন ও অধ্যাপক মিন্‌হাস এই যুক্তি খণ্ডন করেন। তাঁদের বক্তব্য, বৃদ্ধির হার বিচার করা উচিত একটি 'ট্রেন্ড' দেখে, দুটি সময়ের প্রান্তবিন্দুর মধ্যে ফারাক দেখে নয়। কারণ এর মধ্যেও অনেক ওঠানামা থাকে। একদম যুক্তিপূর্ণ কথা। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমস্ত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে তারা দেখান বৃদ্ধির হার মোটামুটি অপরিবর্তিতই এবং তা হলো শতকরা ৩.২ শতাংশ। এরপরও বিতর্ক সূচিত হলো। অশোক রুদ্র লিখলেন :

> এই বক্তব্যকে ভিত্তি করে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনোর মত নতুন কিছু সমস্যা দেখা দিল। বর্তমান লেখক আবিষ্কার করলেন যে, গ্রাফের ট্রেন্ডকে যে বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র দিয়ে নির্দেশিত করা যায় সেগুলি এমনই যে তাদের একটির চেয়ে অপর কোনটি সূচকগুলির দীর্ঘমেয়াদী গতিকে বেশি ভালভাবে নির্দেশিত করছে বলা যায় না। অর্থাৎ ঐ বিভিন্ন গাণিতিক রেখাগুলিকে নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে খুব তফাৎ করে দেখা যায় না। কিন্তু তারা এমনই যে তাদের কোনটির অন্তর্নিহিত বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকে, অপর কোনটির অন্তর্নিহিত বৃদ্ধির হার ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় একমাত্র সিদ্ধান্ত যা বিজ্ঞানসম্মত তা হল এই যে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকছে না হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে তা জোর করে বলার কোন উপায় নেই।

পরিসংখ্যানকে ব্যবহার করে কিভাবে যথার্থ সিদান্তটি নেওয়া হবে তা নিয়ে যেমন অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ্‌দের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তেমনই সমস্যা রয়েছে অন্যদিকেও। সেটি রাজনৈতিক এবং অনেক বেশি ঘোলাটে করে দেয় বাস্তবচিত্রকে। যেমন ১৯৬৮-৬৯ সালের পর থেকে কৃষি নিয়ে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যেত সরকারি ভাবে তা প্রকাশ করা হতো বিকৃত ভাবে— শুধুমাত্র সবুজ বিপ্লবের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য তুলে ধরতে। একথা জানা গিয়েছিল ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রকের তৎকালীন অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান উপদেষ্টা জে. এস. শর্মার নিজের লেখায়।[১]

এই যখন সর্বভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের চিত্র তখন রাজ্যের ছবিটা কেমন? সেখানেও একই রকম বিতর্ক এবং সরকারি তথ্যের অতিরঞ্জন। বিশ্বাস আর নির্ভরতা শব্দ দুটো বোধহয় অর্থনীতির পরিসংখ্যানে খাটে না। এর কারণ এই নয় যে, শুধু অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদরা গবেষণার কারণে নতুন নতুন পদ্ধতিতে আসল সত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেন, সমস্যাটা এখানে জটিল হয় যখন রাজনৈতিক কারণেই সাফল্য তুলে ধরতে সরকারের পক্ষ থেকেই ভিত্তিহীন অতিরঞ্জনে দুষ্ট পরিসংখ্যান পেশ করা হয়। তারপরেও সমস্যা আছে। সেটি তৃণমূলস্তরের। যাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে পরিসংখ্যানগুলি আসে তারা এ-ব্যাপারে আদৌ প্রশিক্ষিত নন। তাছাড়া পরিসংখ্যান ঠিক ভাবে জোগাড় করে লেখা হচ্ছে, না কি ঘরে বসে রিপোর্ট করা হচ্ছে তাও দেখা হয় না বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে সর্বস্তরে এ রাজ্যের কৃষি নিয়েই অভিজ্ঞতাটি তুলে ধরেছেন সচ্চিদানন্দ দত্ত রায় তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ *বিকল্প পরিসংখ্যানের আলোকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অগ্রগতি*-তে।

রাজ্যে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব দেখাতে গিয়ে

ব্যাপক ভাবে তথ্যেও অতিরঞ্জন ঘটানো হয়। তিনি লিখেছেন :

> ১৯৬৮-৬৯ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে রাজ্যে উৎপাদিত গমের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার মেট্রিক টন, কৃষিদপ্তর তাকে ফাঁপিয়ে করলেন ২.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন। পরের বছর ব্যুরোর হিসাব ১.৪৭ লক্ষ মে. টন আর কৃষিদপ্তর প্রকাশ করলেন ৪.৮২ লক্ষ মে. টন। অতিরঞ্জনের মাত্রা বাড়তেই থাকল : ১৯৭৫-৭৬ সালে ব্যুরোর ক্ষেত্র-সমীক্ষাজাত গম উৎপাদনের হিসাব যেখানে ৫.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন, কৃষিদপ্তর জাহির করলেন রাজ্যে গম উৎপাদন হয়েছিল ১১.৮৭ লক্ষ মে. টন অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। চালের ক্ষেত্রে একই ভাবে অতিরঞ্জন চলছিল উৎপাদনের পরিসংখ্যানে। পরিসংখ্যান ব্যুরো ক্ষেত্রসমীক্ষা করে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে বোরো চালের উৎপাদনের হিসাব তৈরি শুরু করে। সে বছরের বোরো চালের উৎপাদিত পরিমাণ ছিল ওই সংস্থার হিসাব অনুসারে ১.৭৫ লক্ষ মে. টন। আর কৃষিদপ্তর পরিসংখ্যান তৈরি করলেন ৩.১৭ লক্ষ মে. টনের। এমনি ধারা চলতে লাগল বোরো উৎপাদন নিয়ে। ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে আখের গুড় উৎপাদনের ব্যুরোর তৈরি হিসাবের সঙ্গে অতিরঞ্জন মিশ্রণ হতে শুরু হল। আলুর ক্ষেত্রে রং চড়ানো হল ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে। এখানে উল্লেখ্য কৃষিদপ্তর তাঁদের পরিবেশিত এসব পরিসংখ্যানের ভিত্তি সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন অদ্যাবধি প্রকাশ করেননি। রাজ্যে কৃষি- পরিসংখ্যানের সর্বময় কর্তা হলেন কৃষি-সচিব, তিনি বা তাঁর দপ্তর পরিসংখ্যান ব্যবহারকারী অর্থনীতিবিদ বা রাশিবিজ্ঞানী সমাজের কাছে ব্যাখ্যা দেন না— কী কারণে রাশিবিজ্ঞান-সম্মত ক্ষেত্র- সমীক্ষালব্ধ পরিসংখ্যান (ব্যুরোর তৈরি) পরিবর্তন করা হল। তিনি এ বিষয়ে পরিসংখ্যান ব্যুরো বা অন্য কোনো সংস্থার রাশিতথ্য গ্রহণ, বর্জন বা পরিবর্তন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট, কৃষিমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা ছাড়া অন্য কোথায়ও তাঁর দায়বদ্ধতা নেই। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে এই সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন বা নির্দেশ অনুসারেই এসব কর্মকাণ্ড চালিত হয়। সৌভাগ্য এই যে পরিসংখ্যান ব্যুরোর নমুনা সমীক্ষা পরিচালনা বা ফলনের হিসাব তৈরির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা এঁরা সৃষ্টি করলেন না। ফলে দুই প্রস্থ হিসাব— ব্যুরোর সমীক্ষাভিত্তিক ও কৃষিদপ্তরের নিজস্ব কারণ- নির্ভর— পাওয়া গেল। এ-অবস্থা চলল ১৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত।

পরিসংখ্যান নিয়ে এই বিতর্ক-বিভ্রান্তি-রাজনীতি পেরিয়ে একটি সত্যে পৌঁছোনো যাচ্ছে যে সর্বভারতীয় নিরিখে কৃষিতে এই রাজ্য ষাটের দশক থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদন গড়ে বছরে ১.২ শতাংশ হারে বেড়েছে। কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে মাত্র .২৫ শতাংশ হারে। সারা ভারতে উৎপাদন বেড়েছিল এই সময়ে ২৫ শতাংশ হারে এবং জমির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে হেক্টার পিছু ১.৭ শতাংশ হারে। এই হিসেবের মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, আখ, তুলো, ভোজ্য তেলের মতো প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শস্য। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হবে বিশেষ করে যে ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছিল চা ও পাট চাষ। বস্তুত পাট চাষ এত বেশি জমিতে হওয়া শুরু হয় যে ধান বা অন্য শস্য চাষের কাজ কমে গিয়েছিল।[২]

এই সময়ে সারা ভারতে ভূমি সংস্কার ও জমিদারি উচ্ছেদ আইন চালু হয়। এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া পড়েছিল এই রাজ্যেও। জমিদারী প্রথার অবসান ঘটলেও ভূমিসংস্কার প্রথার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তিত নতুন মালিকরা জমিতে খুব বেশি বিনিয়োগ করতে চায় নি। ফলে বেসরকারি পুঁজিও উদ্যোগের অভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভাগচাষিরাও ভয়ে ছিল উচ্ছেদের। পরের বছর চাষ করতে পারবে কি না তা নিয়ে যেখানে নিশ্চয়তা নেই সেখানে উন্নতির কথা কে ভাববে? বলা বাহুল্য, সরকার ও কৃষির ঠিকাদারের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে যাবতীয় বৃবস্থা নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ভাবনাও ছিল না। কারণ স্বাধীনতার পর যারা দেশের ও রাজ্যের শাসন-ক্ষমতায় ছিলেন তারা চেষ্টা করেছেন দেশীয় পুঁজির বিকাশের স্বার্থে অর্থনীতিকে সাজাতে। কখনই সরকারি নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা তারা চান নি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কারণে এমনিই এ দেশের কৃষি ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক। ফলে কাঠামোগত সংস্কারের জন্য ভূমিসংস্কার জরুরি ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভুরা যেহেতু পুঁজির পৃষ্ঠপোষক সেহেতু তারা চালকের আসনে রেখেছেন দেশীয় ভূস্বামীদের। জমিদারি প্রথার অবসান ঘটাচ্ছে যে শাসকগোষ্ঠী তারাই বিকেন্দ্রীকরণের পথ বন্ধ করে কৃষিক্ষেত্রকে তুলে দিল বড়ো জোতদার বড়ো চাষিদের হাতে। পরিবর্তন হলো এইটুকুই। এর পাশাপাশি কৃষি খামার গড়ার মতো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হলো না।

সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় যোজনা পর্যন্ত তিনটি নদী প্রকল্পে পশ্চিমবাংলার চাষযোগ্য জমির এক চতুর্থাংশেও নিশ্চিত সেচের ব্যবস্থা করা যায় নি। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে মাত্র সাড়ে সাত হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটে। মাত্র দু'হাজার পাম্পে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয় অত দিনে। পশ্চিমবাংলায় সেচ ও বিদ্যুতের ব্যর্থতায় বেশির ভাগ জমিই থেকে যায় এক ফসলি হয়ে।[৩] কৃষির বিকাশে ও কৃষিক্ষেত্রের পুনর্গঠনে পরিকাঠামো তৈরিতে সরকারি স্তরে একের পর এক এমন ব্যর্থতায় এ রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ওই সময়ে ক্রমশ কমছিল।[৪] এমনকি সবুজ বিপ্লবের পর্বেও এই রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ে নি।

পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু খাদ্য কমে যায় পঞ্চদশ ও ষাটের দশক থেকেই। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে জনসংখ্যার চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্রাতিরিক্ত হারে। এছাড়াও এ রাজ্যে তখন ধাক্কা মারছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (তখনও বাংলাদেশ হয় নি) থেকে নিরন্তর উদ্বাস্তু স্রোত। দেশভাগের যন্ত্রণা সেই অর্থে সব থেকে বেশি পোহাতে হয়েছিল এই রাজ্যকেই। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াকে হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা। সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছিল তৎকালীন শাসকবর্গ। এরই সঙ্গে সঙ্গে উপর্যুপরি আরও একটি বড়ো প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় দেশে জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে। এ রাজ্যে ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা নিষিদ্ধ হলেও আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে স্বনামে-বেনামে এমনকি বাড়ির কাজের লোক পোষা বেড়াল-কুকুরের নামেও প্রচুর জমি পুরোনো জমিদাররা রাখতে সমর্থ হয়েছিল। নতুন করে গজিয়ে ওঠা এই ভূস্বামীদের কাছে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর চাইতে বেশি প্রয়োজন ছিল জমি নিয়ন্ত্রণে রেখে কৃষি ব্যবস্থায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখা। ফলে জনস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ রাজ্যে

খাদ্য উৎপাদন না ঘটায় দেখা দেয় অভূতপূর্ব খাদ্য সংকট। ষাটের দশকটি ছিল এ রাজ্যের কৃষি-অর্থনীতি-রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই দশকেরই গোড়ার দিকে ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৫-৬৭-তে ভয়াবহ খরার ফলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন ভীষণ ভাবে কমে যায়। ৬২-৬৩-তে কমে ছিল ৭.৫ শতাংশ; ৬৫-৬৬-তে কমে যায় ১২.৯ শতাংশ (সূত্র : রাজ্যের আর্থিক সমীক্ষা, ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৭)। খাদ্যসংকট এই সময়ই চরম আকার নেয়। ৬৫-৬৭ পর পর দু'বছর দক্ষিণে ছাড়া ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যেই প্রবল খরা হয়। ফলে অন্য রাজ্য থেকে প্রয়োজন মতো খাদ্য আমদানির উপায় ছিল না। ধনী কৃষক ও চালের মিলগুলি থেকে উদ্বৃত্ত চাল সংগ্রহ করার চেষ্টা করে সেই সময়ের প্রফুল্ল সেন নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। ইতিমধ্যে গরিব চাষি ও ভূমিহীনদের সংগঠন করে বামপন্থী নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। একদিকে তাদের নেতৃত্বে খাদ্য আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধে। অন্যদিকে শুরু হয় নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন। স্বাধীনতার ঠিক আগে ও পরে তেভাগা আন্দোলনে গরিব চাষি, বর্গাদার ও খেত মজুররা যে সমস্ত দাবি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, নকশালবাড়ি আন্দোলনে তারই উত্তরণ ঘটে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আঙ্গিকে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। বস্তুত বামপন্থী আন্দোলন ও এই কৃষিব্যবস্থাকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক অবস্থান ও আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে গিয়ে এবং রাজনৈতিক লাইন নিতে গিয়ে সংসদীয় ও সশস্ত্র সংগ্রামের দুটি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে থাকে। গ্রামের জোতদার ধনী কৃষকদের সঙ্গে দরিদ্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন খেত মজুর বর্গাদারদের শ্রেণিদ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে উভয় পথেই তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। কৃষি উৎপাদন এতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত এ রাজ্যের কৃষিতে ব্যাপকমাত্রায় উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই ছিল অন্যতম বড়ো কারণ। ১৯৬৭-র নির্বাচনে সংসদীয় বামপন্থীরা (সিপিআই, সিপিআইএম; কংগ্রেসের প্রতি অবস্থানকে কেন্দ্র করে সবে তখন সি পি আই ভেঙে সিপিআইএমের জন্ম হয়েছে তবু দুপক্ষই একসঙ্গে সরকার গঠন করে) জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এই সময়ে গুজব ওঠে যে মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জমি দেওয়া হবে বর্গাদারদের। হেরে যাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজের পায়ের তলার জমি খুঁজে পেতে এই গুজব রটিয়েছিল। তাতে এক বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জমি বাঁচাতে হাজার হাজার বর্গাদার উচ্ছেদ করে জমির মালিকরাই। ফলে তখন চাষবাস লাটে ওঠে। অন্যদিকে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিল সিপিআইএমের চরমপন্থী গোষ্ঠী যারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত না। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলই সঠিক পথ বলে তারা মনে করতেন। চারু মজুমদার, কানু সান্যালের মতো এই সব ভাবনার নেতারা নকশালবাড়িতে কৃষকদের গণহত্যার প্রতিবাদে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। সিপিআইএম তাদের বহিষ্কৃত করলে ১৯৬৯ সালে তারাই তৈরি করে সি পি আই (এম এল)। গড়ে ওঠে নকশালবাড়ি আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতিহাসে এই আন্দোলন ও পর্বটি ছিল অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরবর্তী সময়েও কৃষি উৎপাদনের হার পড়ে নি। কৃষিতে অনেক প্রযুক্তিগত উন্নতি হয় এই সময়ে। তবুও উৎপাদন বড়ে নি গ্রামে জমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে চৈত্রশানপূর্ণ দাম্ভিক সম্পর্কের জন্য। আশি সাল পর্যন্ত এটাই ছিল এ রাজ্যের কৃষির এক চরম বাস্তবতা।

রাজ্যে কৃষির উৎপাদন বাড়তে থাকে আশির দশক থেকে। এর পিছনেও ছিল একটি বড়ো রাজনৈতিক পালাবদল ও সেই পালাবদল হেতু কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনী সম্পর্কের ব্যাপক পরিবর্তন। জরুরি অবস্থার শেষে দেশব্যাপী কংগ্রেস বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে এ রাজ্যেও ক্ষমতায় আসে সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বাম দলগুলির জোট সরকার। তারা এসেই অসমাপ্ত ভূমি সংস্কারের কাজ শুরু করে। শুরু হয় রাজ্য জুড়ে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত এবং সিলিং উদ্বৃত্ত জমি কেড়ে তা ক্ষুদ্রচাষি ও ভূমিহীনদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের কাজ। এতে কৃষিক্ষেত্রে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে এতকালের অপাঙ্‌ক্তেয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, বর্গাদাররা। ফলও ফলে হাতে হাতে। আগে (১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত) সারা ভারতের খাদ্যোৎপাদন বাড়ত আড়াই শতাংশ করে। এই রাজ্যেও সেই হার ছিও তখন মাত্র ১.৭ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকারের এই ভূমি সংস্কারের ফলে ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৯-৯০ সময়কালে রাজ্যে খাদ্যোৎপাদনের হার বেড়ে যায় ৩.৪ শতাংশ হারে। সারা ভারতের গড় ছিল তখন ২.৭ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর রাজ্যে ১৯৭৮-৯১ সালের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির হার বিগত একশো বছরের মধ্যে সব চাইতে বেশি হয়। এই হার ছিল ৪.৬ শতাংশ, যা এককথায় সারা ভারতেই নজির সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৯৯০ সালের পর উদারবাদী নীতি দেশে চালু হওয়ার পর এ রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ফের কমতে থাকে। এই ঘটনা অবশ্য সারা দেশেই দেখা যায়। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির ভাগ কমতে থাকে। এটাকে উন্নতশীল লক্ষণ বলে অর্থনীতিবিদরা স্বাগত জানাতে থাকে বটে কিন্তু ঘটনা হলো কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষদের জন্য অন্যক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় কম। ফলে চাপ থেকেই গেল কৃষিতে। নতুন উদারনীতির সুযোগ নিয়ে কৃষিকে শক্তিশালী করার বদলে ফের সেখানে একমাত্রিক পুঁজিবাদী উন্নয়নের রোডম্যাপ চালু হলো। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই নীতিতে কৃষিকে সরকারি ভাবে উপেক্ষা করা শুরু হলো। সংস্কারের নামে তুলে দেওয়া হতে থাকে সার, তেলে ভর্তুকি। হু হু করে দাম বাড়তে থাকে কৃষি উপকরণের যন্ত্রপাতির। এদিকে কৃষি বিপণনে গড়ে ওঠে নি কোনো উপযুক্ত পরিকাঠামো, তৈরি হয় নি রপ্তানির পর্যাপ্ত সুযোগ, ঠিক সময়ে ঘোষিত হয় না সহায়ক মূল্যে, ছোটো ও মাঝারি চাষিরা পায় না ব্যাঙ্ক ঋণ। চারদিক থেকে চাপ বাড়তে থাকে। কমতে থাকে ফসল উৎপাদন, বাড়তে থাকে দেনার দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা। গোটা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও এমনই একটা ছবি উদারনীতির দু'দশকে গ্রামে গঞ্জে চেনা হয়ে গেছে।

বাম আমলে কৃষি উন্নয়ন ঘটেছে যেহেতু ভূমি সংস্কারের পথ ধরে কৃষক নিজেই বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। কৃষিবৃদ্ধির এই হারের সঙ্গে যদি পরিকাঠামো গড়ে তোলায় সরকারি বিনিয়োগ বাড়ত তাহলে রাজ্যে কৃষির উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হতো। বামফ্রন্ট সরকার এটি করে নি। আরও একটা ঘটনা হলো ভূমি সংস্কারের এমন অসাধারণ সাফল্য পাওয়ার পরেও রাজনৈতিক কারণেই ভূমি সংস্কার তারা মাঝপথে থামিয়ে দেয়। ক্ষমতায় স্থায়িত্ব আসে যে ভূমি সংস্কারের হাত ধরে তার প্রাথমিক ফসল ছিল পার্টির কৃষকসভায় মধ্যবিত্ত চাষির প্রাধান্য। যারা আর চায় নি দরিদ্র প্রান্তিক চাষির উত্থান। এক্ষেত্রেও শ্রেণি দ্বন্দ্ব। গ্রামের বিকেন্দ্রীকরণে

পঞ্চায়েতও নিয়ন্ত্রণ করে তারা। ফলে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন দশ জনের মধ্যে সাতজন পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন বড়োলোক, ভূস্বামী। ১৯৮৮ সালে সফল ভূমিসংস্কারের পর সাধারণ কৃষক ও শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিরাই পঞ্চায়েতকে চালাতে থাকে। গরিব কৃষক ও ক্ষেত মজুরই ছিলেন ৫৮ শতাংশ সদস্য। বিশ বছর পর এই পঞ্চায়েতই হয়ে যায় শাসকদলের দলদাস নির্ভর প্রতিষ্ঠান। বিকেন্দ্রী-করণের সুফল কুক্ষিগত হয় রাজনৈতিক ভাবে। ফলে সার্বিক কারণে এ রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে বাড়তে থাকে অসাম্য এবং চাষের প্রতি অনীহা । ১৯৯০-৯১ সালে এই রাজ্যে নিট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৪২৪ হেক্টার। শস্য নিবিড়তা ছিল ১৫৯ শতাংশ। ২০০৯-১০ সালে নিট চাষযোগ্য জমির এলাকা কমে দাঁড়ায় ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮০৭ হেক্টারে। যদিও শস্য নিবিড়তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮১ শতাংশ। সাকুল্যে বলা যায় বাম জমানায় এ রাজ্যের কৃষি উৎপাদন ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল। ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৭৪ লক্ষ টন, ২০০১-২০০২ সালে তা পৌঁছায় ১৬৫ লক্ষ টনে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ সালের মধ্যে উৎপাদন অবশ্য কমে দাঁড়ায় ১৫৮ লক্ষ টনে। এদিকে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে এতদিনে অনেক। সেই হিসেবে প্রয়োজন ছিল ১৮৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য স্বাভাবিকের মধ্যে সবজি ও মৎস উৎপাদনে প্রথম, আলু উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থান অধিকার করেও, ধানের উৎপাদনশীলতায় সর্বভারতীয় গড়ের অনেক উপরে থেকেও (সারা ভারতে প্রতি হেক্টারে ২১৩০ কেজি, এই রাজ্যে তা ২৫৪৭ কেজি) বাঙালির খাদ্যাভাব ঘোচাতে অন্য রাজ্যের থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। ছোটো ও প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তারা ক্রমশ জমি বেচে দিচ্ছে। অন্যের জমিতে খাটছে অন্য কোনো সংগঠিত পেশায় যেতে না পেরে লোকাল ট্রেনে চেপে চলে আসছে কলকাতায়, বর্ধমানে, দুর্গাপুরে, মেদিনীপুরে, খড়্গপুরে, শিলিগুড়িতে, মালদায়, বহরমপুরে, কৃষ্ণনগরে। সারা দিনে যেখানে হোক কিছু একটা কাজ করে পেট চালানোর রসদ জোগাড় করছে। অসংগঠিত শ্রমিক কর্মী হিসেবে এ ভাবে আলোর নীচেই ক্রমশ জমাট হওয়া অন্ধকারে জন্ম নিয়েছে এক অস্থির ভবিষ্যৎ। বাম জমানায় শেষদিকে গ্রামে গ্রামে রেশন ডিলারদের ঘেরাও, আক্রমণ থেকেই এই রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে তা দাবানলের মতো বামবিরোধী পরিবর্তনের হাওয়ায় রূপান্তরিত হয়। এ সবের পিছনে ছিল বাম শাসনে কৃষি অগ্রগতির প্রেক্ষাপটেই ভূমিসংস্কারের অসম্পূর্ণতায় জমতে থাকা ক্ষোভ বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের বজ্র নির্ঘোষ প্রতিবাদ। বাম নেতৃত্ব এই বিষয়টি যথার্থ ভাবে অনুধাবন না করে কেবল মাত্র ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন। রাজ্যে কৃষির অগ্রগতি সম্পূর্ণ হয়েছে ভেবেই তাঁরা প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পায়ণের প্রসার ঘটাতে গিয়েছিলেন। গ্রাম বাংলা যে ততদিনে ভূমিসংস্কার ও কৃষি অগ্রগতি থমকে যাওয়ায় ভিতরে ভিতরে ছাইচাপা আগুনের মতো জ্বলছে সেটা অনুধাবন করতে পারেনি। বাম নেতৃত্বের ব্যর্থতায় রাজ্যের এই কৃষি পরিস্থিতিই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি করে দেয়।

টীকা

১. Estimates of foodgrains Production : Some Reflections লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ভারত সরকারেরই প্রকাশিত Agricultural Situation in Indian, Vol-26. No-5 (197) রিপোর্টে।

২ ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ হতো প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ একর জমিতে। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে এটা ২৯১.৫ হাজার থেকে ৩১৪.৭ হাজার হেক্টারে। সমগ্র ভারতের তুলনায় এই রাজ্যের মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার পিছনে এটাও একটা বড়ো কারণ ছিল বলে ধরা যায়।

৩. উদয় বসু, 'পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ও সত্তর দশক', *সত্তর দশক*, ১ম খণ্ড, সম্পা. অনিল আচার্য: অনুষ্টুপ)।

৪. সারণি-২: পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার। সূত্র : Changing Trijectorics : Agricultural Growthis W. B. *Economic and Political Weekly*, ২০ জানু ২০১২, পৃ: ৬৪)।

(ক্রমশ)

দুর্বার ভাবনা

পাওয়া যাচ্ছে

কলকাতায় :

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড) শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়) কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র) রাসবিহারী মোড়, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়) ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে বইকল্প [দোতলায়]) বিধাননগর (উল্টোডাঙা) এবং শিয়ালদহ-কল্যাণী শাখা ও শিয়ালদহ-বারাসাত শাখার বিভিন্ন রেল স্টেশনের বুকস্টলে ও অন্যত্র।

কলকাতার বাইরে

□ পশ্চিম মেদিনীপুরে ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড) □ শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা

□ কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এইচ এন রোড □ নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী □ শিলিগুড়িতে বুকস

যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০

হট্টমেলার দেশ রায়গঞ্জ

সুধাংশু চক্রবর্তী

দিনাজপুর জেলার (মানে উত্তর দিনাজপুর) সদর শহর হচ্ছে রায়গঞ্জ। কলকাতা রেলস্টেশন থেকে যার দূরত্ব ৪৪৪ কিমি। এই স্টেশন থেকেই রোজ রাত সাড়ে সাতটায় রাধিকাপুর এক্সপ্রেস পরদিন সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে পৌঁছে দেয় রায়গঞ্জে। আর রিজারভেশান নিয়ে ভাড়া ২২৫ টাকা। অনেকের মতে কৃষ্ণসখী রাধিকার নাম থেকেই রায়গঞ্জ। কারও কারও মতে রাই শস্য সরিষা চাষের চল ছিল বলেই রায়গঞ্জ নাম হয়েছে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল থেকে এই জেলা উত্তর-দক্ষিণে ভাগ হয়ে যায়। চাল চিড়া, গুড়/ এই নিয়ে দিনাজপুর। বাংলার সুলতানী যুগে একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশ দনুজমর্দনের উপাধি নিয়ে এই অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবত এই দনুজ শব্দ থেকে দিনাজপুর নামের উৎপত্তি হয়ে থাকবে। বর্তমানে এই জেলার উত্তরে দার্জিলিং, দক্ষিণে মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর। পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর ও বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে মালদহ ও বিহার রাজ্য অবস্থিত। যার আয়তন ৩১৪০ বর্গ কিমি। এই জেলার ভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে সামান্য ঢালু। তাই জেলার নদীগুলি দক্ষিণবাহিনী। নদীগুলির নাম হচ্ছে— কুলিক টঙ্গন, মহানন্দা, কুর্তা, ভাতা, ডাউক, দোলঞ্চা, ব্যারাং, পিতানু, বেহুলা, শেরয়ানি, গান্ধার, সুদানি, বীণা, সুঁই, কাজালই, কাঁচ, গামারি, শ্রীমতী,বালিয়া, কুমারি ইত্যাদি। আজ এদের অনেকের স্রোতধারা প্রবাহিত হয় না। জেলার আকৃতিটি অনেকটা দাঁড়িয়ে থাকা মুরগির মতো। যার গলার মতো (চিকেন'স নেক) জায়গায় পড়ে যে স্থানটা তার একদিকে রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ (পূর্বদিকে) আর উল্টো অর্থাৎ পশ্চিমদিকে বিহার, দূরত্ব যেখানে কুড়ি কিমি-র কম। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক মানচিত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

এই জেলার অন্তর্গত দুটি মহকুমা রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর, নয়টি ব্লক (রায়গঞ্জে চারটি ও ইসলামাপুরে পাঁচটি), ১৬৫৯ টি গ্রাম, ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৭টি বিধানসভা ও ১টি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। ২০০১ সালোর জনগণনা অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ যেখানে তপসিলি জাতির লোকজন রয়েছে প্রায় সাত লাখের কাছাকাছি, তার সঙ্গে সওয়া এক লাখের মতো তপসিলি আদিবাসী। জেলার প্রধান ভাষা রাজবংশী,বাংলা, হিন্দি, সূর্যপুরী ও উর্দু। জেলার ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি দিঘির নাম— সরাই দিঘি, সুলতান দিঘি, বালিয়া দিঘি, দীপরাজার দিঘি ও হোসেন দিঘি। এর অধিকাংশই পাল ও সেন আমলে কাটা। জেলার প্রধান শহর রায়গঞ্জ। বহু প্রাচীন কাল থেকেই রায়গঞ্জ এলাকাটি ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য খ্যাত। বর্তমানে স্টেশনের অনতিদূরে একটি এলাকার নাম বন্দর, যেখানে এক সময় জাহাজঘাঁটি ছিল। জলপথে বা নদীপথে নানান জিনিসপত্র দেশ বিদেশে রপ্তানি করা হতো। বুখানন হ্যামিলটন তার বর্ণনায় এই অঞ্চলকে 'হট্টমেলার' দেশ মানে হাট ও মেলার দেশ বলে অভিহিত করেছেন। তথ্য তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে, সারা উত্তর দিনাজপুর জেলায় ছড়িয়ে থাকা চল্লিশটি হাট ও একত্রিশটি মেলার নাম। প্রাচীনকাল থেকে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে মেলার একটা ভূমিকা রয়ে গিয়েছে। আনন্দ আর আদান-প্রদানের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রই হলো মেলা। গ্রামেগঞ্জেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সাপ্তাহিক হাটগুলি লুপ্ত হয়ে যায় নি। নানান প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মানুষজন হাটে মিলিত হয়ে কেনা-বেচা করে, আনন্দ করে এবং গ্রাম্য শিল্প সংস্কৃতিকে বহন করে চলে। শহুরে প্রভাব তেমন ভাবে ফেলতে পারেনি এই সব গ্রাম্য হাটগুলিতে। অন্যতম কয়েকটি হাটের কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল হাট, যার বসার দিন সোমবার তাই ওই দিন এলাকার সব স্কুল বন্ধ থাকে; মোহিনীগঞ্জ হাট ও মহারাজা হাট, যেখানে তুলাইপাঞ্জি চাল ও পাটের আমদানি হয় সবচেয়ে বেশি।

জেলা সদরের অফিস মানে জেলা শাসকের অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসগুলির অবস্থান কমলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কর্ণজোড়ায়, রেলস্টেশন থেকে যার দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। এই কর্ণজোড়া ও কমলাবাড়িতেও হাট বসে। আবার রকমারি মনিহারি জিনিসের জন্য এলাকাবাসী চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে বিভিন্ন মেলার দিকে। বিভিন্ন স্থানের মেলায় নানান সম্ভার নিয়ে মিলিত হয় নানান জায়গার মানুষ। উপস্থিত হয় পুতুলনাচ, নাটক, যাত্রা, পালাগান ও রকমারি মনোরঞ্জক উপহার সামগ্রী নিয়ে বিক্রেতারা। ধর্মীয় বিশ্বাস ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভীষণ রকমের যুক্ত এই সব ছড়িয়ে থাকা মেলা। বিশ্বাসের স্রোত কত গভীরে সেটা টের পাওয়া গেল কমলাবাড়ি পঞ্চায়েতের অধীনে 'সতীপুকুর মেলায়'। আগে এখানে একটি শ্মশান ছিল। এলাকাবাসী মৃতদেহ দাহ করে নিকটস্থিত একটি পুকুরে স্নান সেরে নিত। কোনো এক সময়ে নাকি ওই পুকুরে স্নান করে এলাকার কোনো এক সধবা নারী তার স্বামীর চিতায় সহমরণ করেন। তাই লোকমুখে এর নাম হয়ে গিয়েছিল সতীপুকুর। যদিও প্রচার ততটা ছিল না। বছর দশেক আগে এক সাধক এসে এই স্থানটিতে একটি আশ্রম বানায়। শবদাহ করার স্থান কিছুটা দূরে সরে যায় আর চারিদিক ঘিরে নিয়ে কালীমন্দির গড়ে, পুরোনো এক বট-অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বেদী বানিয়ে নেয় আর ওই পুকুরটিও সংস্কার করে। আর চালু করে শিবরাত্রি থেকে ১০ দিন ধরে হওয়া 'সতীপুকুর মেলা'। মেলা উপলক্ষে হাজির হয় সব ধর্মের মানুষ, হরেক রকম গৃহ সামগ্রীর পসরা সাজায় দোকানিরা আর খাবার বিক্রেতারা।

আয়োজিত হয় কবি গান, বাউল ও সংগীতানুষ্ঠান। লোকমুখে ফেরে সতীপুকুরে স্নান করে রোগ নিরাময়ের গল্পকথা। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর এক কর্মীর স্ত্রীর ওই পুকুরে স্নান করে সন্তান লাভ, কিংবা এক জন্ডিস হওয়া রোগীর আরোগ্য হওয়া ইত্যাদি উপাখ্যান। এলাকার মানুষজন বাড়ির কোনো শুভকাজে জল নিয়ে যান এই সতী পুকুর থেকে। এই জেলার অপর মহকুমা ইসলামপুরে আছে সতীপুকুর শ্মশান যেখানে রয়েছে স্বামীর জলন্ত চিতায় প্রাণ দেওয়া সতী মণ্ডল ও সৌগত মণ্ডলের মূর্তি। সতীদাহ থেকে সতীপুকুরের জল— ধর্মীয় বিশ্বাসের পথ-পরিক্রমা।

রায়গঞ্জের এসব কথা বলার কারণ কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে একটা গ্রামের মানুষজন কেমন থাকে তার ইতিসাস-ভূগোলটা একটু আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। মূলত একটি প্রজেক্টের কাজে গিয়েছিলাম রায়গঞ্জ। প্রজেক্টের উদ্দেশ্যটা বেশ বড়ো-সড়ো।

পশ্চিমবঙ্গের আঠেরোটি জেলায় জলসম্পদ বিভাগের অধীনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কৃষকদের জলসেচের সুবিধার্থে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য এলাকার কৃষকদের একটি করে কমিটি তৈরি করে দিতে হবে (ইনসটিটিউশনাল ডেভলপমেন্ট)। ওই সব কমিটি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্ড) হলে সেই কমিটিকেই সরকার পাম্পসেট অর্পণ করবে। ওই কমিটি পাম্পসেট চালনা করবে, রক্ষাণাবেক্ষণ করবে, জল সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করবে অর্থাৎ অপারেশন, মেনটেন্যান্স ও ম্যানেজমেন্ট। কৃষিকাজে এই জল ব্যবহার করে গ্রাহক কৃষকরা উদ্যান বা বাগিচা চাষ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন তথা পশু খামারে জল জোগান দিতে পারবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আড়াইশো থেকে তিনশো বিঘা এলাকার অধীনে থাকা (কম্যান্ড এরিয়া) কৃষককূল উপকৃত হবে। এক একটি প্রজেক্টের বা স্কিমে রয়েছে ছ'টি করে পাম্পসেট, যা বসবে ছটি জমিতে, মানে ছ'জন জমিদাতা (ল্যান্ড ডোনার) বা ওই ছ'জন আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা জলসম্পদ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে যোগাযোগ করতে হয়। বুঝিয়ে দিতে হয়, কোনো একজনের বা ব্যক্তিগত মালিকানার নয়, সমষ্টিগত মালিকানা বা সমষ্টির অধীনে বেশ খানিকটা অঞ্চলে একসঙ্গে জলসেচের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক পাম্পসেটের জল সরবরাহ ক্ষমতা মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বিঘে। তাই এক একটি পাম্পসেটের সরবরাহ ব্যবস্থার অধীনে থাকা গ্রাহক কৃষক সংখ্যা বা তালিকা তৈরি করাটাই প্রাথমিক কাজ আর সেটার সংখ্যা এগারো হতে পারে আবার সাতাশও হতে পারে। তাই ল্যান্ড ডোনারকে বলে দেওয়া যে খুব তাড়াতাড়ি ওই গ্রাহক তালিকাটি বানিয়ে ফেলতে হবে। তারপর ওই তালিকায় থাকা কৃষকদের নিয়ে মিটিং করে স্কিমের উদ্দেশ্যগুলি বুঝিয়ে দেওয়া ও তাদের করণীয় কাজগুলি বলে দেওয়া। এই রকম ভাবে স্কিমের অধীনে বাকি আরও পাঁচটি ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভালো সংখ্যক গ্রাহক কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা বা আগ্রহ জাগানোর কাজটি (মোবিলাইজেশন) সারতে হয়।

এর পরের ধাপের কাজটি হলো কমিটি তৈরি। অন্ততপক্ষে সাত জনকে নিয়ে কমিটি করতে হবে। তাই ছ'জন জমিদাতার অগ্রাধিকার থাকে এর সদস্য পদের। বাকি একজনকে বাছাই করে নিতে হয়। কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব খুবই আবশ্যিক শর্ত। স্কিমের গ্রাহক কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ অনন্তকালের নয়, দুই বা তিন বছর পর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গড়ে নেওয়া যায়। আর হ্যাঁ ওই যে সব মিটিংটিটিং সারতে হয় তা সব নথিভুক্ত (ডকুমেন্টেড) করে রখার জন্য 'মিটিং রিসলিউসান' খাতায় অংশগ্রহণ-কারীদের সই সহ তুলে রাখতে হয়। জানিয়ে দেওয়া হয় কমিটির সদস্যদের যে রেজিস্টার্ড কমিটিকে বছরে অন্তত তিনটি মিটিং করতেই হবে, আর বছরে একবার বাৎসরিক সভা। (অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং)। প্রত্যেকটি কমিটি তৈরি করে সরকার থেকে দেওয়া এগারো পাতার বয়ান টাইপ করে কমিটির সদস্য সদস্যাদের সই সাবুদ নিয়ে জলসম্পদ বিভাগের কোনও যন্ত্রবিদ আধিকারিকের অনুমোদন সহ ওই আবেদনপত্রটি বিভাগীয় ভারপ্রাপ্তর কাছে জমা পড়ে। উনি এই সব আবেদনপত্র কলকাতার সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অফিসে পাঠিয়ে দেন রেজিস্ট্রেশানের জন্য। যেহেতু সেচের প্রয়োজনে স্পষ্ট ভাবে জলজোগান দেবার জন্য কমিটি গড়া হচ্ছে তাই এই কমিটিগুলির নাম হয়— 'জলব্যবহারকারী সংস্থা' তার সঙ্গে এলাকার বা মৌজার নাম যুক্ত করা হয়। যেমন 'জগদীশপুর-কুমারপাড়া জল ব্যবহারকারী সংস্থা'। এই জগদীশপুর মৌজার কয়েকটি এলাকায় তুলাইপাঞ্জি চাল উৎপন্ন হয়। এই চাল রান্নার সময় যে সুবাস ছড়ায় তা আশপাশের বাড়ি থেকেও টের পাওয়া যায়। আর ভাত ছাড়াও পোলাও রান্নার জন্য এর সুখ্যাতি অনেককাল জুড়ে। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে এক সময় গান্ধার ও কাঁচ নদী প্রবাহিত হতো। তাদের তীরবর্তী এলাকায় প্রচুর এই ধান চাষের চল ছিল। এই দুটি নদীর উৎপত্তি বাংলাদেশে। সেখানে এর উপরে বাঁধ দেওয়ার কারণে তাদের স্রোতধারা কমতে কমতে এখন মজে গিয়েছে। তীরভূমি আর প্লাবিত হয় না। তা সত্ত্বেও কিছু উৎসাহী চাষির প্রচেষ্টায়, এই জেলা থেকে বেগুনবিচি, কাটারি-ভোগ,কালনুনিয়া প্রভৃতি উন্নত মানের ধান কালের অতলে হারিয়ে গেলেও, তুলাইপাঞ্জি হারিয়ে যায়নি। তাই আজও মঙ্গলবারে মোহিনীগঞ্জের হাটে উন্নতমানের তুলাই চালের আমদানি হয়ে থাকে এবং এই চাল কিনতে দূর দূরান্তের বহু মানুষ ভিড় জমিয়ে থাকে।

তো যাই হোক এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে ওয়াকিবহাল করা এবং পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক জেলার জন্য নির্দিষ্ট আছেন সরকারি নোডাল অফিসার। এই জেলার জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতরের চিফ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) পদাধিকার বলে এই প্রজেক্টের নোডাল অফিসার। এই প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত নাম 'আদমি প্রজেক্টে' (এডিএমআই— অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট ইন মাইনর ইরিগেশান)।

এই আর্থিক বছরে (২০১২-১৩) উত্তর দিনাজপুর জেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল আটচল্লিশটি স্কিম। ওই স্কিমের তালিকায় অনুমোদন থাকে জেলাশাসক সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকের। আপাতত (মার্চ ২০১৩) ঊনত্রিশটি কমিটি বা ডব্লিউইউএ (ওয়াটার ইউজারস অ্যাসোসিয়েশন)-কে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশান অ্যাক্টে রেজিস্ট্রি করানো গেছে। পনেরোটি কমিটির আবেদন পত্র জমা পড়েছে, কলকাতার সোসাইটি রেজিস্ট্রেশান অফিসে। বাকি দুটি ক্ষেত্রে কমিটি গড়ার কাজ চলছে। কিন্তু রাত কত হলো, উত্তর মেলে না, উত্তর মেলে না স্কিমের কাজ কবে থেকে শুরু হবে। সরকারি কাজ, হুকুম নড়ে তো, হাকিম নড়ে না। কাজের টেন্ডার হয়েছে, বাতিলও হয়েছে। বাতিল কেন করা হলো তার মূল্যায়ন চলছে। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ঠিক হবে কিভাবে আবার টেন্ডার ডাকা হবে। তারপর টেন্ডার ডাক-জমা পড়া-ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া ইত্যাদি।

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন তারপর বর্ষা নেমে পড়বে। ওয়ার্ক অর্ডার বার হলেও মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করা যাবে না। মানে সেই সেপ্টেম্বর। তখন আবার মাঠে মাঠে আমন ধানে পাকা রঙ ধরতে শুরু করবে, ফলে পিছিয়ে যাবে কাজ।

জলদস্যুতা আজও চলে সমানতালে। সেটা কি রকম, সেই কথায় আসি। পাঁচ অশ্বশক্তি ডিজেল চালিত পাম্পসেট চালিয়ে ভূর্গস্থ জল সেচের কাজে লাগাবার জন্য কোনো অনুমতি লাগে না। তাই যথেচ্ছ ভাবে, বিশেষ করে বোরো ধান চাষে, মাটির তলার জল তুলে ফেলা হচ্ছে। বোরো মরশুমে (জানুয়ারি-এপ্রিল) উচ্চফলনশীল ধানের (হাই ইল্ড ভ্যারাইটি) ফলনে খাদ্যের জোগান কিছুটা সামাল দিলেও মূল্যবান ভূগর্ভস্থ জলসম্পদে টান পড়ছে। বৃষ্টির জল (জুলাই-সেপ্টেম্বর) চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির তলায় যতটা সঞ্চিত হচ্ছে তার অনেকগুণ বেশি ওই চার মাসে বোরো চাষের জন্য তুলে ফেলা হচ্ছে। আজকের খাবারের জোগান দিতে গিয়ে মাটির নীচের জলস্তর হু হু করে নেমে যাচ্ছে। অথচ বৃষ্টির জল অসংখ্য পুকুর, খাল, বিল, নদী, নালায় ধরে রাখার সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। রায়গঞ্জের বুক চিরে চলে যাওয়া কুলিক নদীর দীর্ঘ ১০০ কিমি যাত্রাপথে তার দু'পাশে থাকা বেশ কিছু অঞ্চল বর্ষা মরশুমে জলমগ্ন হয়ে থাকে, যার জন্য ওই সব এলাকায় আমন ধান চাষ করা যায় না। অথচ এই সব এলাকায় মাটির নীচের জল তুলে নিয়ে বোরো মরশুমের চাষ করা হচ্ছে। দিনের পর দিন এই নদী মজে যাচ্ছে। বর্ষার সময় ছাড়া কঙ্কালসার দেহ নিয়ে পড়ে থাকে। অথচ এর অববাহিকায় গড়ে উঠেছে কুলিক পাখিরালয়, যেখানে বহু প্রজাতির পাখিরা শীত মরশুমে এসে ভিড় জমায়। অসংখ্য দর্শক সমাগম ঘটে। ভালো পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। এই নদী মজে গিয়ে স্রোত হারিয়ে ফেলতে থাকলে পাখিরা কি আর ভিড় জমাবে। পাখিরালয় হয়ে যাবে খালিআলয়, বন্ধ হয়ে যাবে পর্যটন শিল্প। শেরপুর জল ব্যবহারকারী সংস্থার সচিবের কথায় 'কুলিক নদী বাঁচিয়ে রাখলে আমরাও বেঁচে থাকব। চাষ-আবাদ করতে পারব স্বচ্ছন্দে। তাই শুরু করতে হবে 'কুলিক বাচাঁও আন্দোলন'। না হলে নদীও শেষ আমরাও শেষ।

বোরো মরশুমে ধান চাষে জলসেচ করার জন্য ডিজেল পাম্পসেট ভাড়া করার রেট কিরকম বলতে কর্ণজোড়া (জেলা প্রশাসনিক কেন্দ্র) থেকে মাত্র চার কিমি দূরত্বে শুশিহার জলব্যবহারকারী সংস্থার সচিব জানালেন পুরো বোরো সিজনে ব্যবহার করা জন্য পাম্পসেটের মালিককে দিতে হবে বিঘে প্রতি তিন মণ ধান, ডিজেলের দাম কৃষকের (খুব কমপক্ষে চল্লিশ লিটার লাগবেই যার দাম অন্তত এখন ৪০ গুণ ৫২, অর্থাৎ ২০৮০ টাকা)। উনি আরও জানালেন বিঘে প্রতি সব মিলিয়ে খরচা পড়ে অন্তত সাড়ে ছয় হাজার টাকা। ফসলের পরিমাণ ছয় কুইন্টাল যার বাজার মূল্য হচ্ছে ওই পরিমাণ টাকাই, লাভ প্রায় থাকে না। তাই অনেকেই এই সিজনে ভুট্টা চাষ শুরু করে দিয়েছে। আর ভুট্টা বেচে ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। এবারে প্রকৃতিও বিরূপ হয়ে গিয়েছে। শীতের আমেজটা বেশ দীর্ঘ হওয়ার দরুন বোরো চাষের বীজতলা তৈরি করতে পারেনি ভালো করে অনেকেই। ফলে বোরো চাষের এলাকা এবার অনেকটা কমে গেছে। সেই জায়গার দখল নিয়েছে ভুট্টা।

সাধারণত তিনটে করে চাষ করে, খরিফ বা বর্ষা মরশুমে আমন ধান, আমন ধান উঠলে সেই জমিতে সরিষা লাগায় অথবা গম চাষ করে, আবার কেউ সরিষা করে নিয়ে বোরো চাষ করে, আবার কেউ গম করে নিয়ে পাট লাগিয়ে দেয়। যাই চাষ হোক না কেন, তুলনায় বোরো চাষের মানে মাটির তলার ভাণ্ডার খালি হতে থাকা। ইলেকট্রিক পাম্পসেটের ক্ষেত্রেও যুক্তিটা একই রকম। মানে বেশি জলের জোগান মানে বেশি ইউনিট পুড়বে মানে বেশি বেশি বিল উঠবে। আবার বোরো চাষে লাভও বেশি থাকে না। তাই জল কম ব্যবহার করে যে ফসল চাষ করে লাভ থাকে সেটাই করা দরকার। তবে ওই যে 'দেখাদেখি চাষ, পাশাপাশি বাস'। এত দেখাদেখি সত্ত্বেও পরিকল্পনা মানে স্কিমগুলির গুরুত্ব অন্য ভাবে করা যেত। অনুমোদিত আটচল্লিশটি স্কিমের মধ্যে একটি মাত্র নদীর জল ব্যবহার করার স্কিম। বাকি সব মাটির তলার জল ব্যবহার করার স্কিম। বর্ষার জল নদী-নালা-খাল-বিল ইত্যাদিতে ধরে রেখে মজে যাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে, (সারফেস ওয়াটার) মাটির উপরের জল ব্যবহারের পরিসর বৃদ্ধির সুযোগ ছিল।

উত্তর দিনাজপুরে যে উনত্রিশটি ওয়াটার ইউজারস অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে মানে সরকারি স্বীকৃতি মিলেছে তার মধ্যে বারোটির কাছ থেকে তুলে আনা কিছু তথ্য পরিবেশনা করা যাক। এই বারোটিতে গ্রাহক কৃষক পরিবার রয়েছে ১০৫৭টি। বারোটি স্কিম মানে বাহাত্তরটি ইলেকট্রিক পাম্পসেট। তাহলে প্রতি পাম্পসেট পিছু গড়ে পনেরোটি গ্রাহক কৃষক পরিবার থাকছে। এই সব পরিবারে গড় আয়তন (অ্যাভারেজ ফ্যামিলি সাইজ) ৫.১জন। মোট জনসংখ্যা ৫৩৪৬ জন (পুরুষ ২৯৭৩, মহিলা ২৩৭৩)। মহিলা জমির মালিক হচ্ছে মাত্র ঊনচল্লিশ জন (৩.৭)। হায়রে অর্ধেক আকাশ, বঞ্চিত জমির মালিকানাতেও।

কাঁচা বাড়ি বলতে বোঝায়, মাথায় টিনের চাল আর দেওয়াল দর্মার বা মাটির। খড় বা বিচালির ছাউনি দেখা যায় না। তো এরকম কাঁচা বাড়ির অস্তিত্ব রয়েছে ৫৬৯ পরিবারের (৫৪.০)। টেলিভিশন রয়েছে ৫১২টি পরিবারের (৪৮.৮)। বাইক রয়েছে ১৩০ জনের (১২.৩)। ২১৭ জন গ্রাহক কৃষকের (২১.০) ডিজেল পাম্পসেট রয়েছে যাকে ব্যবহার করে যথেচ্ছ ভাবে, অপরিকল্পিত ভাবে জল তোলা হচ্ছে।

এই হট্টমেলার দেশ রায়গঞ্জ মনোক্রপ এরিয়ার এককালীন চাষ এলাকা-র তালিকায় পড়ে না এবং অধিকাংশ গ্রাহক কৃষকরা মাঝারি চাষি, ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষি নয়। আবার অনেকেই মনে করে সমষ্টিগত না হয়ে ব্যক্তিগত পাম্পমোটর স্কিম হলে ভালো হতো। কারণ সমষ্টিগত মালিকানা বিষয়টি অনেরে কাছে 'খায় না মাথায় দেয়' গোছের ব্যাপার। এদের মানসিক স্তর একেবারে কাদার তাল হয়ে রয়েছে। এই কাদার তাল মানব সম্পদে না দানবে পরিণত হবে— সেটার জন্য বেশি নয় আগামী বছর দুয়েকের মধ্যেই প্রকাশ্যে আসবে। এখনও অবধি সেই ধরণের কোনো প্রশিক্ষণ এই আম-আদমির জন্য করা যায়নি। তাই আদমি প্রজেক্টের উদ্দেশ্য (অবজেকটিভ) আম-আদমির কানে বীজমন্ত্রের মতো ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেটা করতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজন আস্থা অর্জন। যেটা আবার টেন্ডার পদ্ধতির জন্য হোঁচট খেয়েছে। সব সংস্থার সদস্যদের একটাই প্রশ্ন কবে শুরু হবে ইলেকট্রিক পাম্পসেট বসানোর কাজ। খুবই স্বাভাবিক এই উদ্বিগ্নতা ও আশঙ্কা। কেননা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে গত জুনে, বছর ঘুরতে চলল। সরকারি মহল থেকে এই বিলম্বের ব্যাখ্যা বা বিবৃত্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে এই বোধটাই দেখা যাচ্ছে না। মাথার ভিতরে 'দাতা-গ্রহীতা' কাজ করে। উন্নয়ন যাদের জন্য এবং যারা পরিচালনা ও তদারকিতে, সবারই প্রয়োজন ওরিয়েন্টশন। শুধু তা হলেই নয়, রঙ যেন মরমে লাগে।□

ব্যথা যখন ঘাড়ে

পুণ্যব্রত গুণ

ঘাড় ঘোরানো যাচ্ছে না, কখনও ঘাড় থেকে হাতে ব্যথা নামছে, ঝিনঝিনি ভাব, অবশ হয়ে যাওয়া— এমনটা অনেকেরই হয়। আমার তো হয়, আপনাদের হয় না? আমাদের এবারের আলোচনা— ঘাড়ে ব্যথার কারণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা নিয়ে।

ঘাড়ের গঠন

মোট ৩৩টা ছোটো ছোটো হাড় (কশেরুকা) পুঁতির মালার মতো একটার ওপর একটা বসিয়ে তৈরি মানুষের মেরুদণ্ড— তার মধ্যে ঘাড়ে ৭টা। অবশ্য কেবল মানুষের নয়, সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীরই ঘাড়ে কশেরুকার সংখ্যা ৭। তা উট বা জিরাফের মতো লম্বা গলার প্রাণীই হোক বা হাতি, শুয়োরের মতো ছোটো গলার প্রাণী।

যখন বাচ্চা মাথা উঁচু করতে শেখে, তখন তার ঘাড় সামনের দিকে বেঁকে যায়—একে বলে অগ্রবক্রতা। ঘাড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকা বাদে বাকি পাঁচটা মেরুদন্ডের অন্যান্য অংশের কশেরুকার মতো। কশেরুকা দেখতে যেন পাথর-বসানো আংটির মতো। মাঝখানের ফুটোটা দিয়ে সুষুম্নাকান্ড নামে। ফুটোর সামনের অংশকে কশেরুকা কান্ড বলে, পেছনের অংশকে কশেরুকা খিলান বলে।

দুটো কশেরুকা কান্ডের মধ্যে থাকে একটা করে মেরু চাকতি (intervertebral disc)। উপাস্থি বা কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি এই চাকতিগুলোর বাইরের দিকটা রবারের মতো নরম আর চাকতির ভেতরের অংশটা জেলির মতো— যাকে বলে চাকতি মজ্জা। চাকতি মজ্জাকে ঘিরে থাকে একটা শক্ত আবরণী, যা পর পর দুটো কশেরুকা কান্ডকে ধরে রাখে। দুটো কশেরুকার মধ্যে থাকা এই নরম গদির মতো মেরু চাকতির জন্য আমরা মেরুদন্ডকে সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকাতে পারি। ঘাড়ের মেরুদণ্ডে মোট পাঁচটা মেরু চাকতি থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যে কোনো মেরু চাকতি থাকে না।

ঘাড়ের সুষুম্নাকান্ড থেকে মোট আট জোড়া স্নায়ু বেরোয় সরু আন্তঃকশেরুকা ফুটো দিয়ে। প্রথম জোড়া বেরোয় খুলির নীচের অংশ ও ঘাড়ের প্রথম কশেরুকার মাঝখান দিয়ে। আর অষ্টম জোড়া বেরোয় ঘাড়ের সপ্তম কশেরুকা ও পিঠের প্রথম কশেরুকার মাঝখান দিয়ে। দুটো কশেরুকার মাঝের ফুটো অর্থাৎ যেখান দিয়ে স্নায়ুমূল বেরোয়, তার একদম কাছেই থাকে মেরু চাকতি। মেরু চাকতি একটু সরে গেলেই স্নায়ু মূলে চাপ পড়ে, তখন ঘাড়ে ব্যথার চেয়েও বেশি যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় সেগুলো হলো— হাতে ব্যথা নামা, ঝিনঝিনি, অসাড় ভাব ইত্যাদি।

ঘাড়ে ব্যথার রকমফের

ঘাড় বলতে বোঝায় গলার পেছন দিক। তাই ঘাড়ে ব্যথা বলতে গলার পেছন দিকের ব্যথাকেই বোঝানোর কথা। কিন্তু অনেকে প্রায়ই মাথার পেছন দিকের ব্যথা, কাঁধের ব্যথা এমনকি হাতের ব্যথা বোঝাতেও 'ঘাড়ে ব্যথা' শব্দটা ব্যবহার করেন।

মস্তিষ্কের পেছন দিকের টিউমার ঘাড়ে ব্যথা হিসেবে দেখা দিতে পারে, ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে ঘাড়ে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন রোগে। হাতের কলকানি ও ঝিনঝিনি ব্যথা হতে পারে ঘাড়ের মেরুদণ্ডের বিভিন্ন রোগে, কাঁধের জোড়ের আশেপাশের রোগে, এমনকি কব্জির রোগেও।

ঘাড়ে ব্যথার কারণ

ঘাড়ের যেসব রোগে ঘাড়ে ব্যথা হয়, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো— ১. আঘাতের কারণে ব্যথা; ২. গ্রীবা কশেরুকা বিকার, বাংলা নামটা কঠিন মনে হচ্ছে? সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস বললে নিশ্চয়ই চেনা যাবে। ৩. ঘাড়ের মেরু চাকতি সরে যাওয়া; ৩. রিউমাটয়েড বাত; ৪. ঘাড়ের হাড়ে যক্ষা; ৫. সারভাইকাল রিব সিন্ড্রোম— ঘাড়ের কশেরুকা থেকে সাধারণত রিব বা পাঁজর বেরোয় না, বেরোয় বুক-পিঠের পাঁজর থেকে। সারভাইকাল রিব সিন্ড্রোমে ঘাড়ের সপ্তম কশেরুকা থেকে পাঁজর বেরোয়। তা স্নায়ুতে চাপ দিয়ে ব্যথা তৈরি করে।

ঘাড়ের বাইরের যে সব রোগে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ১. উচ্চ রক্তচাপ; ২. উদ্বেগ; ৩. মস্তিষ্কে টিউমার।

রোগ নির্ণয়

যে কোনো রোগের মতো ঘাড়ে ব্যথায়ও প্রথমে ইতিহাস নেওয়ার পালা। তারপর শারীরিক পরীক্ষা করা। দেখা হয়—ঘাড় ঝুঁকে, বেঁকে বা ঘুরে আছে কিনা। আর পেছন থেকে দেখা হয়— ১. চামড়ায় কোনো দাগ আছে কিনা। ২. পিঠের দু'দিকের তেকোনা হাড় স্ক্যাপুলা দু'টোয় কোনো বৈষম্য আছে কি না। ৩. দু'দিকের মাংসপেশীর মধ্যে কোনো বৈষম্য আছে কি না। ৪. কোনো দিকের কাঁধ উঁচু হয়ে আছে কি না। ৫. পুরো বাহু বা হাতের পেশী শুকিয়ে গেছে কি না।

তারপর দেখা হয়— ১. কোথাও টিপলে ব্যথা হচ্ছে কি না। ২. কোথাও ফোলা আছে কি না। ৩. গলার সামনের দিকে শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডও টিপে দেখা হয় সেখানে কোনো গন্ডগোল আছে কি না।

এরপর দেখা হয় ঘাড়ের নড়াচড়া—সামনে, পেছনে, পাশে ও ঘোরানো। পরীক্ষা করা হয় দুই হাতের স্নায়ু। দেখা হয় দুই কব্জির নাড়ি।

ঘাড়ে ব্যথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা

১. এক্স-রে হলো ঘাড়ে ব্যথার কারণ নির্ণয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পরীক্ষা। সামনে পেছনে

(A-P view) এবং পাশ থেকে (Lateral view) ছবি তোলা হয়। ঘাড়ের একদম ওপরের কশেরুকা দু'টোকে দেখতে অবশ্য মুখের ভেতর দিয়ে বিশেষ ভাবে এক্স-রে তুলতে হয়।

২. সি টি স্ক্যান।

৩. এম আর আই স্ক্যান-এ মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়াও স্নায়ুমূল, সুষুম্নাকান্ড ও মেরু চাকতির মতো কোমল কলাগুলোর ছবি পাওয়া যায়, যা সি টি স্ক্যানে দেখা যায়। তবে খরচাও অনেক বেশি।

৩. মায়েলোগ্রাফি হলো মেরুদণ্ডের ফাঁক দিয়ে সূঁচে করে রঞ্জক ঢুকিয়ে তারপর এক্স-রে করা। এম আর আই স্ক্যান চালু হওয়ার পর এ পরীক্ষা করার দরকার হয় না বললেই চলে।

৩. EMG (Electromyelogram—বৈদ্যুৎ পেশী লেখ) ও NCV (Nerve Conduction Velocity—স্নায়ু পরিবহন বেগ)—এই দুই পরীক্ষায় ঘাড়ের রোগে কোন্ স্নায়ুমূল আক্রান্ত এবং তার ফলে কোন্ পেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে তা প্রায় নিখুঁত ভাবে বলা যায়।

৪. বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষাও রোগ-নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ঘাড়ে ব্যথা রুখতে

এমন ভঙ্গিমায় থাকুন যাতে ঘাড় সোজা ও খাড়া থাকে। মাথা সামনে বেশি ঝুঁকে থাকবে না, আবার পেছন দিকেও বেশি থাকবে না।

খুব নরম বিছানায় বা খুব শক্ত বিছানায় শুলে মেরুদণ্ড এমন ভাবে বেঁকে থাকে যা ঘাড় ও কোমরের পক্ষে ভালো নয়। আদর্শ বিছানায় সঠিক ভাবে শুলে মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। তুলোর তোশক বা রাবার-ছোবড়ার সরু গদি ভালো।

ঘাড়ে ব্যথা হলে অনেকে মাথায় বালিশ দেন না বা খুব পাতলা বালিশ নেন— এতে ঘাড় আরও সামনের দিকে বেঁকে যায়, ঘাড়ে ব্যথা বাড়ে। থুতনি থেকে কাঁধের দূরত্ব যতটা, বালিশ হওয়া উচিত ততটা উঁচু। এর থেকে পাতলা বালিশ হলে ঘাড় একদিকে বেঁকে থাকে। বালিশ মাঝারি মাপের নরম তুলোর হলে ভালো। চিত হয়ে শোওয়ার সময় বালিশ কেবল মাথার নীচে না রেখে কাঁধ, ঘাড় ও মাথার নীচে রাখা উচিত।

ঘাড়ে ব্যথার একটা বড়ো কারণ কম্পিউটারে কাজ করার সময় ভুল ভাবে বসা। কম্পিউটার টেবিল এমন হওয়া উচিত যাতে মনিটরের পর্দা থেকে চোখের দূরত্ব এক ফুটের বেশি না হয়। স্ক্রিনের কেন্দ্র চোখ বরাবর না হয়ে সামান্য একটু নীচে থাকা উচিত যাতে ঘাড় পেছনে বেঁকিয়ে দেখতে না হয়।

কাজের মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিলে ঘাড়ে ব্যথা কমানো বা রোখা যায়।

এছাড়া মাথা উঁচু করে, শিরদাঁড়া সোজা রেখে দাঁড়ান। ওজন বেশি হলে তা কমাতে হবে। বিশাল ভুঁড়ি ও বেশি ওজন হলে কোমর ও ঘাড়ের অগ্রবক্রতা বাড়ে। ঘাড়ে ব্যথার সময় বাচ্চাকে কোলে নেওয়া উচিত নয়। ঘাড়ে ব্যথা থাকলে মাথায় ওজন নেওয়া উচিত নয়। হাই হিল জুতো পরা উচিত নয়, এতে ঘাড় ও কোমরের অগ্রবক্রতা বাড়ে। গাড়ি চালানোর সময় সিটে যেন মাথা রাখার হেড রেস্ট থাকে, তাহলে ঘাড় পেছন দিকে বেশি বেঁকে গিয়ে চোট লাগার সম্ভাবনা কমে।

সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস

ঘাড়ের মেরুদণ্ডে সবচেয়ে বেশি যে রোগ দেখা যায় তা হলো এটা। এতে কশেরুকার নীচের দিকের মেরু চাকতিগুলো ক্ষয় পেতে থাকে, চাকতি মজ্জা বেরিয়ে আসে। তার জন্য স্নায়ুমূল অবধি পরিবর্তন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কশেরুকার প্রান্ত থেকে পাখির ঠোঁটের মতো হাড় বাড়ে। পরে দুটো কশেরুকার মধ্যেকার অস্থিসন্ধিগুলোর ক্ষয় হয়। এ রোগ সাধারণত ৪০ বছর বয়সের ওপরে দেখা যায়। ঘাড়ে ব্যথা আস্তে আস্তে বাড়ে। ঘুম থেকে ওঠার পর ব্যথা বেশি থাকে। ব্যথা মাথার পেছনে, মাথার সামনে, পিঠের মাংস পেশিতে, একটা বা দু'টো হাতে ছড়াতে পারে। হাতে ঝিনঝিনি, অসাড় ভাব বা দুর্বলতা হতে পারে।

ঘাড়ে ব্যথার চিকিৎসা

চিকিৎসার সুবিধার্থে ঘাড়ে ব্যথা, বিশেষত সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস-এর উপসর্গ ও লক্ষণগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কেবল দিন কয়েকের ঘাড়ে-ব্যথায় ঘাড়ে গরম সেঁক আর বেদনানাশক বড়িতেই সাধারণত সেরে যায়। ২. স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ার লক্ষণ ছাড়া ঘাড়ে ও হাতে ব্যথা, পক্ষাঘাত বা অসাড় ভাব নেই। হাতে ও আঙুলে ব্যথা লাগে, কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করে পেশীর দুর্বলতা বা চামড়ার অসাড়তা খুঁজে পান না। কিছুদিনের বিশ্রাম, অল্প ক'দিন বেদনানাশক বড়ি খাওয়া ও ব্যায়াম চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়। কখনও-সখনও ঘাড়ে লাগানোর কলার-এর প্রয়োজন হয়। ৩. স্নায়ুমূলে চাপ থাকলে হাতে অসাড়তা ও বেশি দুর্বলতার চিহ্ন থাকে। এ ক্ষেত্রে সপ্তাহ তিনেকের বিশ্রাম, ঘাড়ে লাগানোর কলার ও বেদনানাশক ওষুধে উন্নতি না হলে কখনও অপারেশনের দরকার হতে পারে। ৪. দুই হাত, দুই পায়ে পক্ষাঘাত ও মল-মূত্র ত্যাগে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে জরুরি অপারেশনের দরকার হতে পারে।

এছাড়া বিশ্রাম—ঘাড়ে ব্যথায় যে পদ্ধতি নিশ্চিত ভাবে কাজ করে তা হলো বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম।

ঘাড়ে পরার কলার : ঘাড়ের ক্ষতিকর নড়াচড়া বন্ধ রাখাই এর উদ্দেশ্য। কলার নরম বা শক্ত হতে পারে। নরম কলার ফেল্ট বা স্পঞ্জে তৈরি, শীতকালে ব্যবহারের উপযোগী, কারণ গরমে ঘামে ভিজে যায়। শক্ত কলার প্লাস্টিকে তৈরি, এতে কয়েকটা ফুটো থাকায় হাওয়া চলাচলে ঘামে ভেজার সমস্যা থাকে না। এক টানা তিন সপ্তাহের বেশি কলার ব্যবহার না করাই উচিত, তাতে ঘাড়ের মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, ঘাড়ের মেরুদণ্ডের সচলতা কমে যায়।

ঘাড়ের ব্যথায় ওষুধ : প্রথম পছন্দের ওষুধ হলো প্যারাসিটামল, প্রদাহ থাকলে আইবুপ্রোফেন। স্নায়ুমূলের ব্যথা কমাতে অ্যামিট্রিপ্টিলিন, গাবাপেন্টিন ইত্যাদি কাজ করে। এছাড়া বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ওষুধ লাগে। যেমন— ঘাড়ের যক্ষ্মা রোগের যক্ষ্মারোধী ওষুধ, রিউমাটয়েড বাতে স্টেরয়েড, ক্লোরোকুইন, মেথোট্রেক্সেট ইত্যাদি। ঘাড়ে টান দেওয়া বা সারভাইকাল ট্রাকশনের ব্যবহার আজকাল কমে এসেছে।

ঘাড়ে ব্যথায় ব্যায়াম তিন ধরণের : ১. ঘাড়ের পেশীগুলোকে শক্তিশালী করার ব্যায়াম। ২. ঘাড়ের পেশীগুলোকে প্রসারিত করার ব্যায়াম। ৩. ঘাড়ের ভঙ্গিমা সঠিক রাখার ব্যায়াম। ব্যায়ামগুলো কোন্টা কোন্ অবস্থায় কি ভাবে করতে হবে তা এই নিবন্ধের আওতার বাইরে।

ঘাড়ে ব্যথায় অপারেশন : কোনো চিকিৎসাতেই যখন হাতে ব্যথা কমছে না, স্নায়ুর ওপর চাপ যখন বেড়েই চলেছে, এম আর আই ছবিতে যখন গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুমূলে চাপ ধরা পড়ছে, সরে যাওয়া মেরু চাকতি যখন সুষুম্নাকান্ডে চাপ দিচ্ছে বা যখন ঘাড়ের মেরু নালী সংকোচন ধরা পড়ছে তখন কষ্ট কমাতে অপারেশন করাতে হয়। তবে অপারেশনের পরও কষ্ট না কমার উদাহরণ কম নয়। □

ওড়িশার কন্দমালে দলিত মেয়েদের ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত রিপোর্ট

ন্যাশনাল ক্যাম্পেন অন দলিত হিউম্যান রাইট্‌সএর নেতৃত্বে এলএডব্লিউ ও ওড়িশা ফোরাম ফর সোশ্যাল অ্যাকশন, এবং কিছু সংখ্যক মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক যৌথ ভাবে ওড়িশার কন্দমাল পরিদর্শনে যান। উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত ও একটি নিরপেক্ষ রিপোর্ট পেশ করা। তদন্তকারী দলে ছিলেন:

১. **আশা কোটওয়াল**, সাধারণ সচিব, অল ইন্ডিয়া দলিত মহিলা অধিকার মঞ্চ, নিউ দিল্লি।

২. **নম্রতা ড্যানিয়েল,** ন্যাশানাল ক্যাম্পেন অন দলিত হিউম্যান রাইটার্স, নিউ দিল্লি।

৩. **মঞ্জুপ্রভা ঢাল**, ন্যাশানাল অ্যালায়েন্স ফর উম্যান অর্গানাইজেশন ।

৪. **বিগনেশ্বর সাহু**, সাংবাদিক।

৫. বিজয়ালক্ষ্মী রৌতরে সচিব, (সহযোগ), ভুবনেশ্বর, ওড়িশা।

৬. **দিব্যা রাফায়েল**, ওড়িশা ফোরাম ফর সোশ্যাল অ্যাকশন।

৭. **রাজেশকুমার জেনা**, অ্যাডভোকেট ও মানবাধিকার কর্মী।

৮. **মহেন্দ্র পারিদা**, শিশু অধিকার কর্মী।

৯. **ধীরেন্দ্র পন্ডা**, সিভিল সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটার্স।

১০ জানুয়ারি, ২০১৩-তে হওয়া তদন্তের ওপর ভিত্তি করে এই দলটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাঁদের মুখ্য পর্যবেক্ষণ :

১. তদন্তকারী দলের উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য এবং প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কেস বিস্তারিত ভাবে রিপোর্টের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে।

২. রিপোর্টে উল্লিখিত যৌন নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনাতেই ধর্ষণ ও খুন পূর্বপরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত।

৩. ধর্ষিতা মেয়েরা বা তাদের পরিবারের লোকেরা কেউই জানে না যে তাদের আইনত অধিকার কি ও সুবিচারের জন্য তাদের কি করা উচিত।

৪. অনগ্রসর জাতি বা উপজাতির কেউই কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় টিকাবারি ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্তরা প্রায় ৫ মাসের বেশি সময় ধরে নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি গলায় ছুরির আঘাত পেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পরও ধর্ষণের শিকার মেয়েটি কোনো ক্ষতিপূরণ, সুরক্ষা বা সুবিচার পায়নি।

৫. তদন্তকারী দল এও লক্ষ করে দেখেছে যে, স্থানীয় পুলিশ বা থানা কেউই মেয়েটির অভিযোগ কিংবা এফআইআর নথিভুক্ত করেনি। এমনকি সেই ঘটনার জন্য করা এফআইআর-এর কোনো কপিও বাড়ির লোকদের দেওয়া হয়নি।

৬. পুলিশি তদন্তের প্রচুর ফাঁকফোকর রয়ে গেছে, এমনকি পুলিশ বাড়ির লোকেদের ভয় দেখিয়ে বয়ান বদলাতে বাধ্য করেছে বলেও জানা গেছে।

৭. চার্জশিট প্রত্যেকটি কেসের ক্ষেত্রে দেরিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাতে পারেনি।

৮. ধর্ষিতা মেয়েদের বাড়ির লোকদের উপর মিথ্যে ও অমূলক অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে উল্টো চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

৯. উল্লিখিত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার কোনো কার্যকারিতার প্রমাণ মেলেনি। অসংখ্য ফোন বা চিঠি পাঠানোর পরও তাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। এমনকি প্রশাসনের তরফ থেকেও মেয়েটির পুনর্বাসনের কোনো চেষ্টা হয়নি।

১০. কিশোরী মেয়েদের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর তাদের ভাই-বোনেরা এবং বাকি ছেলেমেয়েরা ভয়ে স্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রস্তাব

১. ওড়িশা সরকারের উচিত এই ধরণের অভিযোগ এবং কেসগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটানো।

২. প্রত্যেক কেসের ট্রাইবুনালের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করা দরকার।

৩. তদন্তসাপেক্ষ ঘটনার ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চার্জশিট পূরণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪.জেলা এবং রাজ্যস্তরে SC/ST PoA অ্যাক্ট-এর পর্যালোচনা করতে হবে।

৫. ধর্ষণের শিকার মহিলারা এবং তাদের বাড়ির লোকেদের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসন জরুরি। পরিবারের অন্তত একজন ব্যক্তির চাকরি, দুর্ঘটনা কবলিত মেয়ের জন্য আবাসিক স্কুলের ব্যবস্থা এবং ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬. স্বাস্থ্য দপ্তর এই ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত মেয়েদের জন্য এবং তাদের বাড়ির লোক এবং সাক্ষীদের জন্য ট্রমা কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

৭.এই দুর্ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে সত্বর সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন পঞ্চায়েত কমিটির।

৮. ধর্ষিতা মেয়েদের স্কুলে ফিরিয়ে নেওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে শিক্ষা দপ্তরকে।

৯. ওড়িশার রাজ্য ও জেলা স্তরে সংখ্যালঘুদের নিয়ে কমিশন তৈরি করা দরকার যা কেবল ওড়িশার দলিত ও সংখ্যালঘু শ্রেণির বিষয়গুলির ওপর নজর রাখবে ও তার দেখভাল করবে।

১০. সঠিক মানের শিক্ষা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুল গড়া দরকার।

১১. প্রতিনিয়ত নজরদারি এবং ফলোআপ করার জন্য শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় এবং শক্তিশালী করা দরকার।

১২. কিশোরী মেয়ে এবং মহিলাদের মধ্যে আইনী অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য জেলা প্রশাসনিক বিভাগকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৩. পুলিশ ও অন্যান্য জেলা আধিকারিকদের লিঙ্গ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা দরকার।

১

সরণগড় ধর্ষণ

ওড়িশার কন্দমাল জেলার সরণগড় পুলিশ থানার অন্তর্গত গ্রাম গুন্ডুরিগাঁও। এই গ্রামের কলোনি-সাহির বাসিন্দা ফকির নায়েকের ৫ বছরের মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে ১৩ নভেম্বর, ২০১২-য় তারই প্রতিবেশী ১৬ বছরের বালিয়া নায়েক ধর্ষণ করে। ঘটনাটি ঘটে বেলা ১১টার সময় যখন প্রিয়াঙ্কা স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাড়ির সামনের রাস্তায় খেলাছিল। বালিয়া তাকে চকোলেট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর প্রিয়াঙ্কার কান্নার আওয়াজ পেয়ে তার মা ছুটে গিয়ে বালিয়ার ঘর থেকে তাকে উদ্ধার করে। প্রিয়াঙ্কার বাবা মা সেইদিনই স্থানীয় পুলিশ থানায় ছুটে যান এবং বালিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেন। তারপর প্রিয়াঙ্কার মেডিক্যাল টেস্ট ও চিকিৎসার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রিপোর্টে মেয়েটির গোপন অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা বলা হয়। এরপর কেস নথিভুক্ত করা হলে অভিযুক্তকে জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়, যদিও শিগ্‌গিরই তার জামিনও মঞ্জুর হয়ে যায়।

ধর্ষিত হওয়ার কারণে এবং সামাজিক ভাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার জন্য প্রিয়াঙ্কার পরিবারকে মানসিক যন্ত্রণা, ভয় ও অবমাননার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এমনকি প্রিয়াঙ্কাকে অন্য কোনো স্থানীয় বাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে বা খেলতে দেওয়া হচ্ছে না। উপরন্তু গ্রামের লোকদের ব্যবহারও এই ঘটনার পর থেকে প্রিয়াঙ্কার পরিবারের প্রতি বদলে গেছে। মেয়েটিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যে এক এনজিও কর্মী জেলার সাব-কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন। তারা দাবি করেন, প্রিয়াঙ্কার জন্য আর্থিক সাহায্য এবং কোনো সরকারি হোমে রেখে তাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার। সাব কালেক্টর মেয়েটির জন্য কেবল ৫০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেন এবং জানান খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে কোনো সরকারি হোমে মেয়েটিকে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে না। ৬ জনের সংসারে প্রিয়াঙ্কা তার বাবা মায়ের প্রথম সন্তান। আরও দু'টি দু'বছরের বোন আছে তার। ঠাকুরমা, ঠাকুরদাকে নিয়ে একত্রেই তাদের সংসার। দলিত শ্রেণির অন্তর্গত এই পরিবার স্টোন চিপস বিক্রি করে সংসার চালান। আর্থিক অবস্থার দিক থেকে তারা বিপিএল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের কোনো বসত জমি বা চাষযোগ্য জমি নেই। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বাসের জন্য যে জমি তাদের দেয় ২০০৮ সালে, কন্দমালের আদিবাসী সম্প্রদায় প্রায় জোর করেই তাদের সেই জমি কেড়ে নেয়। বর্তমানে প্রিয়াংকার বাবা তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া জমির ওপর অস্থায়ী ভাবে পরিবার-সহ বসবাস করছেন। সারাংগাদার সাব ইন্সপেক্টরকে এই বিষয়ে জানিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি তদন্তকারী দলকে জানান যে, এই ঘটনায় অভিযুক্তকে সাজা দেওয়ার বিষয়ে পুলিশ যথেষ্ট তৎপর এবং তাকে গ্রেপ্তার করে জুভেনাইল কোর্টেও কয়েকবার হাজির করেছে।

২

সীমানবারি ধর্ষণ

ওড়িশার কন্দমাল জেলার দারিঙ্গিবারি থানার অন্তর্গত দাদাদামাহা গ্রামের ঘটনা এটি। এই গ্রামের বাসিন্দা বিপিন, আন্তাজিনি ও তাদের ১৩ বছরের মেয়ে সবিতা দিগাল। ২৬ অক্টোবর, ২০১২-র রাতে সবিতাকে তিনজনে গণধর্ষণ করে। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দাদাদামাহা গ্রামের বাসিন্দা কিশোর অঙ্কুর প্রধান, সুলুমা গ্রামের বাসিন্দা উধব প্রধানী ও ভরত প্রধানী। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৬ অক্টোবর, ২০১২ দুর্গাপুজোর সময়ে একদিন সন্ধ্যেবেলা সবিতা তার ১০ বছরের খুড়তুতো ভাই হেবাল দিগালের সঙ্গে পাশের গ্রাম সীমানবারিতে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। ফেরার পথে রাত এগারোটার সময়ে সে এই দুর্ঘটনার শিকার হয়। দাদাদামাহা থেকে সীমানবারির দূরত্ব প্রায় দেড় কিলোমিটার। ঘটনার পরের দিন সকালবেলা কিছু স্থানীয় লোক সবিতার মৃতদেহ সীমানবারি ও দাদাদামাহা গ্রামের মাঝে এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখে। তার দেহের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে তার গোপন অঙ্গে, গলায় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন ছিল। গ্রামের লোক ও বাড়ির লোক তার মৃতদেহ সনাক্ত করে। সবিতার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হলে মেডিক্যাল রিপোর্ট-এ প্রমাণ মেলে যে তাকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। ঘটনাটি দারিঙ্গিবারি থানায় আইপিসি ৩৭৬/৩০২ ধারায় (বেয়ারিং নং ৭৭/১২) কেস নথিভুক্ত করা হয়।

৩

কোটাগড় ধর্ষণ

কোটাগড়ের নববাসীর মদগুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খান্দিয়াগুড়া গ্রামের বাসিন্দা মাইকেল ও চিতকা বোলিয়ারসিং-এর ১৫ বছরের মেয়ে বানিথাকে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধ ২২ ডিসেম্বর ২০১২ বেলা ১২টার সময় ধর্ষণ করে। পরিবারটি ধর্মে খ্রিস্টান ও তফসিলি জাতিভুক্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তিও একই গ্রামের বাসিন্দা। খ্রিস্টান ও তফসিলি জাতিভুক্ত বোলিয়ারসিং-এর পরিবারের সঙ্গে অভিযুক্তর একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ২২ ডিসেম্বর ২০১২-য় প্রতিদিনের মতো বানিয়া বেলার দিকে স্থানীয় একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। সেই সময় অভিযুক্ত তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে এবং একলা পেয়ে তার ওপর যৌন নির্যাতন চালায়।

বানিয়া তার পরিবারকে একথা জানালে তারা লোকলজ্জা ও চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঘটনাটি চেপে যায়। পরে তারা আর সহ্য করতে না পেরে ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ স্থানীয় পুলিশ থানায় দোষীর বিরুদ্ধে একটি কেস রুজু করেন। সেই দিনই পুলিশ এফআইআর-ও নথিভুক্ত করে। কিন্তু পুলিশ তাদের ভয় দেখায় যে, তারা যেন ঘটনাটি সম্বন্ধে কাউকে কিচ্ছু না জানায়। বানিয়ার পরিবার আদালত অবধি ঘটনাটি টেনে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি কারণ আদালতে কেস লড়ার মতো আর্থিক সচ্ছলতা তাদের ছিল না। যদিও তারা চায়, দোষীর শাস্তি হোক। প্রথমে পুলিশ তাদেরকে বয়ান পরিবর্তন করে দিতে বলে, কারণ তারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত। বেরহামপুরে মেয়েটির মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়। তার রিপোর্ট কোটাগড় পুলিশের কাছে জমা আছে বলে জানা গেছে। রিপোর্ট আসার পরে অবশ্য দোষীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বালিগুড়া সাব জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু দোষীকে গ্রেপ্তার করাবার উদ্যোগ নেবার ফলে মেয়েটির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

মেয়েটি মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সে চায় এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে যেখানে তাকে ভয় তাড়া করে ফিরবে না। বর্তমানে মেয়েটি ও তার পরিবার উভয়েই মানসিক যন্ত্রণা ও সামাজিক অপবাদের ভয় এবং চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার লজ্জা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। পরিবারে সব সদস্যই এই চূড়ান্ত মানসিক বিপর্যয়ের শিকার। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা বিপিএল-ভুক্ত। তাদের কোনো বসতবাড়ি বা চাষের জমি নেই।

৪

টিয়ঙ্গিয়া ধর্ষণ

ভুবনেশ্বরের কাছে টিয়ঙ্গিয়া গ্রামের ক্যাথলিক খ্রিস্টান ১৩ বছরের ধর্ষিতা মেয়েটির নাম প্রগতি (পরিবর্তিত)। সংখ্যালঘু দলিত খ্রিস্টান এবং তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রগতি সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী, কন্দমাল জেলার একটি স্কুলে সে পড়ে। বড়ো দুই দাদা ও একটি ছোটো বোনের মাঝে প্রগতি বাবা মায়ের তৃতীয় সন্তান। দুর্গাপুজোর ছুটিতে সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে টিয়ঙ্গিয়াতে যায়। ২৪ অক্টোবরের সন্ধ্যায় সে তার কাকিমার সঙ্গে রাইকিয়ার এক মন্দিরে যাত্রা দেখতে যায়। অনুষ্ঠান শেষে সে তার কাকিমার সঙ্গে রাইকিয়ায় কাকুর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। সেই সময় ছ'জন ছেলে তাকে আক্রমণ করে এবং পাশের ঝোপে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে (তাদের মধ্যে তিনজন যুবক এবং বাকি তিনজন কিশোর) ঘটনাটির সময় মেয়েটির সঙ্গে তার কাকিমা ছিলেন না, তবে কোনো এফআইআর-ও তারা নথিভুক্ত করেননি। কারণ তার বাবার বিরুদ্ধে থানায় একটি কেস চলছে।

ঘটনার পর মেয়েটি আতঙ্কে ভুগছে। কয়েক দিন কেটে যাবার পরও সে ভাবলেশহীন। এই ঘটনায় সে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছে— এক রকম সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এখনও। নিজের অনুভূতিগুলিও সে ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। কাউন্সেলিং থেরাপির পর মেয়েটি কিছুটা সুস্থ হয়েছে বলে মনে হয়। বর্তমানে একজন মনোবিদের কাছে তার মানসিক চিকিৎসা চলছে। প্রগতির ভবিষ্যৎ এবং তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে বার বার আলোচনা বা কথা বলার মধ্যে দিয়ে তার মানসিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এই প্রতিনিয়ত চেষ্টা তাকে নানারকম মানসিক দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করছে। মনোবিদের সাহায্য নেওয়ার পর থেকে সে নিজের দক্ষতা ও গুণগুলো খানিকটা বুঝতে পারছে। এখন তাকে কিছুটা হাসিখুশি, উৎসাহী দেখাচ্ছে। বেড়েছে আত্মবিশ্বাস ও কোনো ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতাও। মনোবিদ্ জানিয়েছেন যে, মেয়েটির মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও বেড়েছে, যা তাকে আবার মূলস্রোতে ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

জন বিকাশ সংস্থা তার একজন কর্মীর মাধ্যমে ঘটনাটির কথা জানতে পেরেছে। জনবিকাশ বাচ্চাটিকে তৎক্ষণাৎ তার ঠাকুরমার বাড়ির থেকে তুলে নিয়ে ভুবনেশ্বরের উইমেনস পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। যেহেতু সার্কেল ইনস্পেক্টর সেই মুহূর্তে থানায় ছিলেন না, তাই তারা কোনো অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেনি। সেখান থেকে জনবিকাশ বাচ্চাটিকে চাইল্ড রাইটস্ কমিশনের চেয়ারপার্সনের কাছে পেশ করে। কিন্তু চেয়ারপার্সনের মধ্যে এ-ব্যাপারে কোনো তাপ-উত্তাপ দেখা যায়নি। তবে তিনি জানিয়ে দেন, আগে থানায় অভিযোগ দায়ের করুন তারপর কমিশনের সামনে হাজির করাবেন। এফআইআর করার জন্যে পুলিশ থানায় ছঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও চেয়ারপার্সন মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। সাড়ে ৮টার সময় যখন থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ এসে উপস্থিত হন তিনি তখন অভিযোগটি নথিভুক্ত না করেই তারা তাদেরকে রাইকা পুলিশ থানায় পাঠিয়ে দেন। পরের দিনই জনবিকাশ মেয়েটিকে তফশিলি কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রী পি এল পুনিয়া এবং সদস্য শ্রীমতী লতাপ্রিয়া কুমারের কাছে নিয়ে যান। কমিশন কেসটিকে ভুবনেশ্বরের উইমেন'স পুলিশ থানায় পাঠান এবং সেখানে ঘটনার অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে মেডিক্যাল টেস্টের জন্য পাঠায় এবং মেয়েটির আর্থিক অনুদান ও পড়াশোনা চালু করার বিষয়ে আবেদন জানিয়ে খোরদার কালেক্টরেট এবং পুলিশের ডেপুটি কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেয়।

কমিশনের এই ঘটনায় হস্তক্ষেপের পর রাইকিয়া পুলিশ ৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। যার মধ্যে একজন যুবক এবং তিনজন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। মেয়েটিকে ঘটনাস্থল সনাক্ত করার জন্য ভুবনেশ্বর থেকে আনা হয় এবং জায়গাটি সে সনাক্তও করে। দ্বিতীয়বার তাকে চিহ্নিত করণের জন্য ফের উদয়গিরিতে আনা হয়। ৪ জনের মধ্যে সে তিন জনকে সনাক্ত করতে পেরেছে। সমাজ কর্মী লতিকা-র সঙ্গে মেয়েটিকে খোরদা কালেক্টরের কাছে ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে পাঠানো হয়।

কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা যায় যে তিনি পুলিশ থানার থেকে কোনোরকম তথ্যই পাননি। খোরদার ডিডব্লিউও তাদের আশ্বস্ত করেন যে তিনি উইমেন পুলিশ থানার থেকে তথ্য পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেবেন। ঘটনা এই যে, কালেক্টরেট একমাস পর ঘটনার রিপোর্ট পান এবং বর্তমানে ক্ষতি পূরণের প্রক্রিয়াটি এগোচ্ছে।

৫

বড়গাঁও ধর্ষণ

ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েটির নাম ললিতা (পরিবর্তিত)। বয়স তিন বছর। গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ছাত্রী। ধর্ম : ক্যাথলিক খ্রিস্টান। জাতি : তফসিলি। গ্রাম : বড়গাঁও

সময়টি ছিল দুর্গাপূজার দিন। ১৭ অক্টোবর ২০১২। রোজকার মতনই তিন বছরের ললিতাকে তার ঠাকুরমার কাছে রেখে তার বাবা মা কাজে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর ললিতার কাকা এসে ক্রীড়ারত ললিতাকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাড়িরই সদস্য হওয়ার জন্য তার ঠাকুরমা কোনোরকম বাধাও দেয় না। এদিকে ললিতার কাকা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। কিছুক্ষণ পর ললিতার বাবা মা ললিতাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে বেশ কিছুক্ষণ আগে তাকে তার কাকা নিয়ে বাইরে গেছে।

বাড়ি ফিরলে তার বাবা মা লক্ষ্য করেন যে সে ঠিকমতন হাঁটতে পারছে না এবং তার গোপন অঙ্গেও যথেষ্ট ব্যথা হচ্ছে বলে জানায়। ব্যথার কারণ তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে আকার-ইঙ্গিতে সব বোঝায় যে তার কাকা তার সাথে কি করেছে।

সব কথা জানার পর তার বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিক্যাল টেস্ট করানোর জন্য নিয়ে যায়। ঘটনার পর ধর্ষণের শিকার হওয়া ললিতাকে বল্লিগুড়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলে সেখানকার ডাক্তাররা তার ফরেন্সিক পরীক্ষা করার কথা বলেন। পুরো ঘটনাটি গ্রাম কমিটিতে পাঠানো হলেও দোষী তার অপরাধ শিকার না করে উল্টে ললিতার বাবা মা-র বিরুদ্ধে মানহানির কেস করেন। এরপর গ্রাম কমিটির উপদেশ মতন ললিতার মা দোষী রঘু দিগাল-এর বিরুদ্ধে ২০ অক্টোবর ২০১২ বল্লিগুড়া পুলিশ থানায় IPC 376 (2) (1) ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন। যার কেস নং 99/2012.

এরপর বল্লিপুড়া পুলিশ থানা থেকে ললিতাকে বেরহামপুরে মেডিক্যাল এবং ফরেন্সিক টেস্টের জন্য পাঠানো হয় এবং পরের দিনই দোষীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ললিতা ও তার মাকে পুলিশ থানায় প্রায় ১২ ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, যা দুজনের জন্যই বেশ কষ্টকর ও পীড়াদায়ক ছিল।

টিকাবালি ধর্ষণ ও হত্যা

২২ বছরের ঋতামতি বেহেরা জেলে পরিবারের মেয়ে। কিন্তু সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে বস্তিগুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে তেঁতুলিয়াপাড়া গ্রামে ইন্দিরা আবাস যোজনায় পাওয়া ঘরে থাকে। ঋতামতি তার বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। তার দিদি এবং বোনের বছর খানেক আগেই বিয়ে হয়ে যায়। তার মায়ের তথ্য অনুযায়ী ঋতামতির বিয়ের অনেক প্রস্তাব এলেও তার গায়ের রঙ কালো হওয়ায় সমন্ধ বাতিল হয়ে যায়। তাদের মূল বাড়ি ফুলবনির নবগুড়া গ্রামে। ঋতামতি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতেই থাকত এবং মাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করত। ৫৫ বছরের প্রতাপ সাহু বিবাহিত এবং তার ৪টি সন্তান আছে। সে অন্যান্য অনগ্রসর উপজাতি (শুঁড়ি)-র অন্তর্ভুক্ত এবং একজন নির্মাণকর্মের কন্ট্রাক্টর।

তার অধীনে ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট-এর অন্তর্গত একটি খাল নির্মাণের কাজ চলছিল সেই সময়। সে ঋতাকে অনেকবার সেই কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য বলত কিন্তু প্রতিবারই ঋতা সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিত। তবে শেষপর্যন্ত ঋতা তার পরিবারের আর্থিক সহায়তার কথা ভেবে প্রতাপের প্রস্তাবে রাজি হয়। ঋতা কখনই একা একা কাজে যেত না। অনেকে মিলে দলবেঁধে যেত। এই ভাবে চলার ২/৩ দিন পরে প্রতাপ ঋতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে যা করতে বলবে ঋতা তাই করতে রাজি আছে কিনা। তার উত্তরে ঋতা বলে যে, যদি সেটি তার ভালোর জন্য হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই করবে। প্রত্যুত্তরে প্রতাপ তাকে একটি চকোলেট নিতে বললে ঋতা তা প্রত্যাখান করে। প্রতাপ তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয় যে, সে বলেছিল যদি তার ভালোর জন্য কোনো কাজ হয় তাহলে সে তা স্বীকার করবে। রীতা তখন চকোলেটটা নিয়ে নেয়।

এরপরে একদিন প্রতাপ ঋতাকে বলে যে সে যেন তার বাড়িতে গিয়ে কিছু সিমেন্ট নিয়ে আসে। সেদিন প্রতাপের স্ত্রী বাড়িতে ছিল না। ঋতা তার বাড়িতে গেলে সেই মুহূর্তে সে তাকে আক্রমণ করে এবং ধর্ষণ করে। প্রতাপ তাকে খুন করার হুমকিও দেয় এবং এই ব্যাপারে কাউকে জানাতে বারণও করে। একই ভাবে প্রতাপ ঋতাকে তিন চার বার ধর্ষণ করে এবং খুনের হুমকি দেয়। এই ঘটনার ফলে ঋতা মানসিক এবং শারীরিক ভাবে আহত হলেও সে ভয়ে বাড়ির কাউকে এই বিষয়ে কিছু জানায় না। কিন্তু প্রতাপের হাতে নির্যাতিত হতে হতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে প্রতাপকে বাধা দিতে শুরু করে। কিন্তু প্রতাপ তাতে বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে তাকে উল্টে প্রস্তাব দেয় যে ঋতা যেন রাতের বেলায় আলাদা একা শোয় যাতে প্রতাপ রাতের বেলায় তার কাছে যেতে পারে। উপরন্তু সে তাকে গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থাও নিতে বলে। কিন্তু অবশেষে রীতা প্রতাপের কোনো প্রস্তাবেই রাজি হয় না এবং ফলস্বরূপ কাজে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। ঋতা তার ১০ দিনের কাজের মজুরি আদায় না করেই কাজ ছেড়ে দেয়।

এই সমস্ত ঘটনা জুন ২০১২-য় ঘটে। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর ঋতা একদিন ভোর ৫টার সময় বাড়ির পিছনের মাঠে প্রাতঃক্রিয়ার জন্য যায়। হঠাৎ করে ৪ জন অপরিচিত ব্যক্তি মুখে কালো রঙ লেপে ঋতাকে আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে প্রতাপকে চেনে কিনা। ঋতা সেই কথা অস্বীকার করলে তারা তাকে বিভিন্ন ভাবে প্রাণে মারার হুমকি দেয় এবং বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাকে অপদস্থ করতে থাকে। যেমন সে প্রতাপের সঙ্গে যৌন কাজ করার সময় টাকা নেয় কিনা ইত্যাদি।

ঋতা এই ঘটনায় বেশ ভয় পেয়ে যায় এবং আরও জোরের সঙ্গে বলতে থাকে যে সে প্রতাপকে চেনে না এবং তার ব্যাপারে কিছু জানেও না। তারপর সে বুঝতে পারে সেই ৪ জনের মধ্যে প্রতাপও একজন। তারপর তারা তাকে হুমকি দেয় এবং তাকে বাধ্য করে যে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে সে কি করে আঘাত পেল তখন সে যেন বলে যে বুনোশুয়োর তাকে আক্রমণ করেছিল। ঋতা কিছু বোঝার আগেই তারা তার মুখে কিছু একটা ছুড়ে মেরে তাকে অজ্ঞান করে এবং গলায় ছুরি মেরে সেখান থেকে পালায়। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসায় ঋতা জানতে পারে যে সে আহত এবং তার সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে, এমনকি সে নড়তে অবধি পারছে না। এদিকে তখন আবার বৃষ্টি পড়ছে। সে একটু নড়ার চেষ্টা করে এবং চিৎকার করে আকুতি জানায় সেখানে যদি কেউ থাকে তারা যেন তার মাকে জানায় এবং তাকে নিয়ে যেতে বলে।

কয়েকজন লোক সেই সময় ওর কাছাকাছি দিয়ে যাওয়ার সময় ঋতাকে দেখতে পায় এবং তার বাড়িতে খবর দেয়। একসময় রীতা টের পায় যে প্রায় জনা ২০/৩০ লোক তাকে চিকিৎসা করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। তখন বেলা ১০টা। এই ৫ ঘণ্টা সে প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছে।

৩ আগস্ট ২০১২-য় সে তার বাবা মাকে নিয়ে এফআইআর নথিভুক্ত করার জন্যে টিকাবাড়ি থানায় যায় এবং ৩১১, ৩২৬, ৩০৭, ৫০৬ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। যদিও থানায় পুলিশও তাকে যথেষ্ট হয়রান করে। এমনকি যে সব মহিলা পুলিশ ছিল তারা তাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট নিরুৎসাহ করতে থাকে। তারা তাকে জানায় যে তার বাবা মা যদি ঋতার সব দায়িত্ব পুলিশের হাতে তুলে দেয় তা হলে তারা তাকে পুলিশে চাকরি করিয়ে দেবে এবং তাকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে।

ঘটনাটি টিকাবাড়ির এবং জি উদয়গিরির ডিএসপি-কে জানানো হলে তারাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সবাই মিলে ঋতাকে তার বয়ান বদলাতে বলেন। তারপরেও ঋতা যখন বিস্তারিত ঘটনা লিখিত ভাবে জমা দেয়, তখন সে বয়ানও বদলে দেয়। রীতা এবং তার বাড়ির লোক বুঝতেই পারে যে প্রতাপ পুলিশের সকলকে টাকা দিয়ে রেখেছে এবং তাই পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অবশেষে ২৯ ডিসেম্বর প্রতাপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঋতা সহ তার পুরো পরিবার যথেষ্ট মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এই ঘটনার পর থেকে তারা যথেষ্ট ভীত এবং সন্ত্রস্ত। ঋতার গলায় এখনও যথেষ্ট যন্ত্রণা হয় এমনকি সে ঠিক করে খেতে অবধি পারে না। কিছুদিন প্রতাপের বন্ধুরা তাদের ভয় দেখায় কিন্তু প্রতাপের স্ত্রীর বকুনিতে তা বন্ধ হয়। ঋতার পরিবারের লোক আরও বেশি সন্ত্রস্ত কারণ তারা জানে প্রতাপের পয়সা আছে যা দিয়ে সে সবাইকে নিজের দলে টানতে পারবে। এমনকি গ্রাম কমিটিও ঋতাকে বা তার পরিবারকে কোনো রকম সহায়তা করেনি এই বিষয়ে। তদন্তকারী দলটি তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে ঋতার এখনও চিকিৎসার দরকার আছে এবং তাকে এবং তার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য খুব শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার। প্রশাসনের উচিত এই ঘটনাটি সম্বন্ধে আরও বেশি তৎপর হয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।

সংকলক : **মধুশ্রী দাস, অরণি চট্টোপাধ্যায়**।

‘যেথায় থাকে সবার অধম সবার হতে দীন’

অনামিকা সেন

‘আমার চোখে কোনো জাতি বা দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি বলতে গেলে সবার আগে সেখানকার মেয়েদের অবস্থার কতটা উন্নয়ন হয়েছে সেটাই বিবেচনার।’ — কথাটা বলেছিলেন ডা. বি আর আম্বেদকর। কোনো দেশের মেয়েদের অবস্থাই সেই দেশের সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। দেশের সংবিধান রচনা করে যতই আইনের সুযোগ-সুবিধা ন্যায়-বিচার দেওয়ার কথা বলা হোক না কেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সামাজিক স্বাধীনতা করায়ত্ত করা যাচ্ছে ততদিন ওইসব সুযোগ-সুবিধা কেবলমাত্র কথার কথাই হয়ে থাকবে।

২০১৩-র এপ্রিলের গোড়ার দিকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দলিত সম্প্রদায় মেয়েদের ওপর ধারাবাহিক ভাবে লাঞ্ছনা ও যৌননিগ্রহের ঘটনা প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ঘটনাটিতে জানা যায় দলিত সম্প্রদায়ের ১০ বছরের একটি মেয়ে ও তার বাবা-মা মেয়েটির ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে থানায় গেলে পুলিশ অপরাধীর বদলে ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েটিকেই জেলে পুরে দেয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত মে মাসে ছাড়া পেলেও পুলিশের তরফ থেকে বার বার মেয়েটিকে ও তার পরিবারটিকে ভয় দেখিয়ে চাপ দেওয়া হয় যাতে তারা বলেন তাদের মেয়ের ওপর কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। এখানেই শেষ নয়।

কেবলমাত্র দলিত পরিবারের মেয়ে হয়ে জন্মাবার অপরাধে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করার মতো স্পর্দ্ধা দেখিয়েছে বলে গ্রামবাসীরা পর্যন্ত পরিবারটিকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রত্যাহার করা না হলে পাথর ছুঁড়ে থেঁতলে মারা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। ধর্ষণে অভিযুক্ত অপরাধী উচ্চবর্ণের রাজপুত হিন্দু, একথা জানাজানি হওয়া মাত্রই স্বগোত্রের লোকজন দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকীর্তি চাপা দিতে।

গত এপ্রিল ২০১৩-য় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত মেয়েদের ওপর বিভিন্ন অত্যাচারের ঘটনার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা।

১৩ এপ্রিল ২০১৩, বিরাওয়াদি, হরিয়ানা

১৬ বছরের দলিত কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়, দু’জন তাকে ধর্ষণ করে। একই দিনে বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে এক ফরেস্ট গার্ড ৭ বছরের এক দলিত বালিকাকে ধর্ষণ করে।

১২ এপ্রিল ২০১৩, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

১৫ বছরের দলিত কিশোরী গণধর্ষণের শিকার। চার ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করে।

৪ এপ্রিল ২০১৩, রৌটক, হরিয়ানা

১৩ বছরের দলিত কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়।

৫ এপ্রিল ২০১৩, বারণসী, উত্তরপ্রদেশ

১৬ বছর বয়সী দলিত তরুণী গণধর্ষণের শিকার। ধর্ষকরা ছিল সংখ্যায় তিনজন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক রশিদ কিদওয়াই বলেছেন, দলিত মেয়েদের ওপর উচ্চবর্ণের নিগ্রহের ঘটনা প্রমাণ করে ধর্ষণ হলো উচ্চবর্ণের বা ক্ষমতাশালী মানুষদের ক্ষমতার বহিপ্রর্কাশ। এর সঙ্গে যৌন আনন্দের কোনো সম্পর্ক নেই।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এদেশে প্রত্যেকদিন কম করে তিনজন দলিত সম্প্রদায়ের মেয়ে ধর্ষণের শিকার হন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৫০০ দলিত মেয়েদের ওপর অত্যাচার ও নিগ্রহের ঘটনার সম্পর্কে করা একটি সমীক্ষায় কেন এই মেয়েরা আইনি সুযোগ সুবিধা পায় না তা জানতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ সামনে এসেছে।

- ☐ অত্যাচারী বা ধর্ষকের সম্পর্কে ভয়।
- ☐ নিজের অত্যাচার-অসম্মানের ঘটনা জানাজানি হলে সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়।
- ☐ যে কোনো অত্যাচার-লাঞ্ছনা বা হিংসা যে আইনত অপরাধ সে বিষয়ে কোনো ধারণা না থাকা বা অসচেতনতা।
- ☐ পুলিশের কাছে যাবার ভয়।
- ☐ টাকা-পয়সার অভাব।
- ☐ পরিবার ও নিজের জাতপাতের লোকজনদের কাছে যে কোনো ধরণের সাহায্য বিশেষ করে মানসিক নিরাপত্তা পাওয়ার অভাব।
- ☐ অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেবার নামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উচ্চবর্ণের বা ক্ষমতাশালী লোকজন যে সালিশি বসায় তাতে দলিতদের নিদারুণ আর্থিক অনটন ও দুর্বল সামাজিক অবস্থানের কারণে নামমাত্র ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সমঝোতার ব্যবস্থাই বেশি ঘটে।
- ☐ পঞ্চায়েত, গ্রাম পরিষদ, পুলিশ চৌকি সব ক্ষেত্রেই কর্তাব্যক্তিদের ধ্যানধারণা হিন্দু জাতপাত, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ধারণায় প্রভাবিত হওয়ায় ন্যায় বিচারের বদলে অভিযোগকারীর কপালেই জোটে শাস্তি।

এই মুহূর্তে ভারতের ৪ কোটি দলিত মেয়ে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য-হিংসার শিকার হয়েছেন। ভারতের দলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের ওপর বিশেষ করে মেয়েদের ওপর উঁচুজাত, ধনী, পুলিশ ও ক্ষমতাভোগী রাজনৈতিক দলের লোকজনদের শোষণ-অত্যাচার কোনো নতুন ঘটনা তো নয়ই, বরং এই সব কার্যকলাপ যেন প্রান্তিক শ্রেণির ওপর সুবিধাভোগী ক্ষমতাবান শ্রেণির অত্যাচারের ধারাবাহিক ঐতিহ্য তৈরি করেছে। দলিত মেয়েরা লাঞ্ছিতা ও অত্যাচারিতা হন জাতিগত কারণে, শ্রেণিগত কারণে এবং কেবল মেয়ে বলে। অর্থাৎ দলিত হিসেবে এবং গরিব ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসেবে আর মেয়ে বলেই তাদের ওপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করা চলে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল প্রকাশিত ২০০১

সালের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে সবচেয়ে বেশি ও ভয়াবহ রকম লাঞ্ছনা ও অত্যাচার বিশেষ করে যৌননিগ্রহের শিকার হন দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েরা। উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী মানুষ, গ্রামের সম্পন্ন জমিদার, পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের যোগসাজসে নির্বিচারে অত্যাচার চলে এদের উপর। রিপোর্টে আরও বলা হয়, এই সব মেয়েদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। তার মধ্যে ত্রিশটা অভিযোগই পরিকল্পিত ভাবে বাতিল হয়ে যায়, মিথ্যে বা সাজানো ঘটনার অজুহাতে।

জাতি-বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্যের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ভাবে বহু বহু বছর ধরে পিছিয়ে পড়া এই দলিত মেয়েরা প্রান্তিকের চেয়েও প্রান্তিক, অসহায়ের চেয়েও অসহায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় এরা আজ পর্যন্ত প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া দূরের কথা, ন্যায়বিচার পর্যন্ত পায় না। অথচ ১৯৮৯ সালে SC/ST PoA Act পাশ হওয়া সত্ত্বেও এর সুযোগ-সুবিধাগুলি আজও তাদের কাছে অধরা রয়ে গেছে। ২০০৭-এ 'ইউএন স্পেশাল র‍্যাপোটিয়ার অন ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন'-এর একটি রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়, ভারতে সুনির্দিষ্ট ভাবে দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েরা Face targeted violence even rape and death from state actors and powerful members of dominant class use to inflict political lessons and crash dissent within the community যা সার্বিক ভাবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে কলঙ্কজনক।

কি কি ভাবে অত্যাচারিত হন এই দলিত মেয়েরা

পা রি বা রি ক হিং সা : দলিত পরিবারের পুরুষেরা অশিক্ষার জন্য সবসময় কম রোজগার করে। বেশির ভাগই নানা ধরণের নেশা, বিশেষ করে মদ্যপানে আসক্ত। বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে মূলত অদক্ষ শ্রমিক হিসেবেই দলিত পুরুষরা নিযুক্ত থাকেন। অনেকেই গ্রামের জোরদার বা ধনী ব্যবসায়ীদের জমি-জিরেত, খামার বাড়িতে ভূমিহীন কৃষক বা মজুর হিসেবে কাজ করেন। বছরে অধিকাংশ দিনই কাজ থাকে না, ফলে অভাবের জ্বালা থেকে বাঁচতে নেশার আশ্রয় নেওয়া এদের কাছে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আর মদ খেয়ে বাড়ির মেয়েদের মারধোর করা, গালমন্দ করা, এমনকি বৈবাহিক ধর্ষণও ব্যাপক হারে ঘটে থাকে।

মি থ্যে মা ম লা য় অ ভি যু ক্ত ক রা :
দলিত মেয়েদের অনেকেই গ্রামের সম্পন্ন পরিবারের গৃহস্থালির কাজকর্মের জোগানদার হিসেবে খুবই কম মজুরিতে কাজ করেন। এই সব মেয়েদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নিয়োগকারীরা প্রায়ই যৌন নির্যাতন চালায়। সামান্য প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের আঁচ পেলেই পরিকল্পিত ভাবে এদের ওপর চুরির অপবাদ দিয়ে মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

সা মা জি ক অ ত্যা চা র :
নীচু জাত, ছোঁয়াছুয়ি ইত্যাদির অভিযোগে দলিত মেয়েদের উচ্চবর্ণের লোকজনেরা চুল কেটে নগ্ন করে মারধোর করে রাস্তায় ঘোরায়।

চি কি ৎ সা জ নি ত অ ব হে লা :
গরিব এবং অসচেতনতার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে হামেশাই হয়রানের শিকার হতে হয় দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েদের। হাসপাতালের ঔদাসীন্যে বহু গর্ভবতী মেয়ে প্রসবের সময় মারাও যায়। আর সে সবের লিখিত কোনো রেকর্ড রাখা হয় না। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরাও এদের অবহেলার চোখে দেখেন। দলিতের ওপর যে কোনো অত্যাচার বা শোষণের ঘটনা সচরাচর মিডিয়ার আনুকূল্যে পায় না। এমনকি সাধারণ মানুষও দলিত সম্প্রদায়ের ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রেজিস্ট্রিও হয় না। দলিত মেয়েরা অত্যাচারিত হলে গ্রামের লোকজন তো বটেই, পরিবারের লোকজনও মুখ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়। এছাড়াও ধর্ষণের মতো ঘটনা প্রকাশ্যে এলে একঘরে করার মতো সামাজিক অবরোধের কবলে পড়তে হয় এই সব দলিত মেয়েদের।

এদেশের বিচার ব্যবস্থাও এই সমস্ত মেয়েদের আসল অবস্থা ও পরিস্থিতি বোঝার কোনো চেষ্টাই করে না। আমাদের দেশের পুলিশি ব্যবস্থাপনা যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব, অশিক্ষিত, প্রান্তিক মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের বদলে নিষ্ক্রিয় কিংবা জুলুমবাজের ভূমিকায় ঐতিহ্যগত ভাবে টিঁকে থাকতে সমর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে কিভাবে পুলিশি বিচার-ব্যবস্থাকে দোষীর কাঠগোড়ায় তুলে আনা যাবে তার কোনো সদুত্তর নেই। আসলে পুলিশের কাজকর্মে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের অভাব, জবাবদিহি করার বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে। সুতরাং এই ট্রাডিশন চলতেই থাকবে।□

ওপার বাংলায় বর্ষবরণের নতুন উৎসব

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মিত্রা মুখোপাধ্যায়

১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৪ এপ্রিল ১৯৮৫। বাংলাদেশের যশোর জেলার কয়েকটি গ্রামে সেদিন ভোরে ঘুম ভাঙল ঢাক, ঢোল, বাঁশি আর কাঁসরের আওয়াজে। আসলে সেদিনটা ছিল বাঙালির বর্ষবরণের দিন, পয়লা বৈশাখ। চৈত্র শেষের চড়ক, গাজন, নীল পুজোর মাসভোর সমাপ্তির পর নতুন বছরের শুভ সূচনা। গেরস্থের ঘরদুয়ার, ধানের মরাইগুলিতে ধোয়ামোছা, গোবর ছড়া দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সব তোড়জোড় সারা। দুয়ারে-চৌকাঠে পিটুলি গোলার মঙ্গলচিহ্নের আলপনা, আমের পল্লব আর ফুলের শিকলি রাতভোর ঝুড়িতে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা। ভোর হলেই মেয়ে বৌ-রা স্নান সেরে সেগুলি ঝুলিয়ে দেবেন দরজায় দরজায়। মঙ্গল হোক গৃহস্থের, সারাটা বছর স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে কাটুক। গেরস্থের বাড়িতে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তুমুল ব্যস্ততা। গতকালের নীলের উপোস শেষে ক্লান্ত শরীরে আলস্য কাটিয়ে গিন্নিবান্নিরা বেলা বাড়লেই হেঁসেলের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তার আগে শুদ্ধ হয়ে ঠাকুরের কাছে নতুন বছরের সিধে, পুজো দেওয়ার ব্যস্ততা ঘরে ঘরে।

ব্যবসায়ীদের ঘরে লক্ষ্মী-গণেশ পুজো, হালখাতার পর্ব। বেলা বাড়ার পর আজ পেট ভরে মনখুশি খাওয়া-দাওয়ার সাধ্যমতো আয়োজন সকলের ঘরেই। সারাদিনের ব্যস্ততায় কোথা দিয়ে যে নতুন বছরের প্রথম দিনটি সময়ের স্রোতে মিশে যায় বোঝাই যায় না। কর্মব্যস্ত এই দিনটা প্রতিবারের চেয়ে এবার কিছুটা আলাদা হয়ে ধরা পড়ল ওপার বাংলার কিছু মানুষের কাছে। ভোরবেলায় বাঁশির সুর, ঢাকের বাদ্যি আর গানের সুরে সকলেই ঘর ছেড়ে বারমুখো। প্রায় চার-পাঁচশো মানুষ সারিবদ্ধ ভাবে গান গাইতে গাইতে চলেছে পথ দিয়ে। সঙ্গে রয়েছে বাঁশি, ঢাক, কাঁসর আর শাঁখের আওয়াজ। তাদের পরনে রঙিন ঝলমলে পোশাক, মিছিলের সামনে রয়েছে অসংখ্য কচিকাঁচার দল। মুখগুলি তাদের নানান পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ারের রঙিন মুখোশ দিয়ে ঢাকা।

পথের দু'ধারে মানুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর প্রাণ ভরে শোনে। বাংলা ভাষায় গানের সুর তাদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়। যশোর ও তার আশপাশের অঞ্চলের মানুষ সেদিন মঙ্গল শোভাযাত্রা নামে এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার সাক্ষী হয়ে রইলেন। বাঙালিয়ানার অন্তঃসলিলা ফল্গুস্রোত আজও যে বেঁচে আছে তার লোকায়ত সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের ধারায় তা সেদিন নতুন করে আর একবার ওপার বাংলার মানুষ অনুভব করলেন।

যদিও নাগরিক জীবনের খরস্রোতা জীবন প্রভাবে সেই শান্ত ফল্গুধারাটিকে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেদিনের সেই মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা বাঙালিয়ানার ষোলো আনার মধ্যে যে কয়েক আনা বাকি ছিল তাকেই পরিপূর্ণ করে দিল পয়লা বৈশাখের বিশেষ দিনটিতে। নতুন বছরের ঊষালগ্নে বর্ষবরণের উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির প্রাণের আনন্দকে সেই প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রাই গৃহবাসীদের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল। পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন আশা-উদ্যমে অনাগত দিনগুলিকে স্বাগত জানাতে এমন অভিনব অপূর্ব শোভাযাত্রা বাংলাদেশে আগে কখনও হয়নি।

বাস্তবিকই সেদিন মঙ্গল শোভাযাত্রাকে নিয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল যশোরকে ঘিরে আরও অন্য কয়েকটি জেলা শহরে। বিভিন্ন মহল থেকে মানুষ উৎসাহী ও আগ্রহী হয়েছিলেন মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্পর্কে। এতো কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক

□□ নাগরিক জীবনের খরস্রোতা জীবন প্রভাবে সেই শান্ত ফল্গুধারাটিকে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেদিনের সেই মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা বাঙালিয়ানার ষোলো আনার মধ্যে যে কয়েক আনা বাকি ছিল তাকেই পরিপূর্ণ করে দিল পয়লা বৈশাখের বিশেষ দিনটিতে। নতুন বছরের ঊষালগ্নে বর্ষবরণের উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির প্রাণের আনন্দকে সেই প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রাই গৃহবাসীদের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল।

শোভাযাত্রা নয়। কারণ এ ছিল বাঙালির ঘরোয়া বর্ষবরণের নিতান্ত সাদামাটা একটি অনুষ্ঠানকে প্রাণের আবেগ দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণের অনুষ্ঠান করে তোলার এক প্রয়াস। এর কয়েক বছর পর ইংরেজির ১৯৯৯ সালে ঢাকার চারুকলা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিন-চার জন উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে ঠিক একইরকম ভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রা পয়লা বৈশাখ যশোর পরিক্রমা করে। মাহাবুব জামাল শামিম, মোকলেসুর রহমান আর হিরন্ময় চন্দ্র এই তিনজন ছিলেন এই কর্মকাণ্ডের হোতা।

সাধারণ কোনো বর্ষবরণের একটা অনুষ্ঠান যে এমন সর্বজনীন উৎসব হয়ে উঠবে এর আগে তা কেউ ভাবতেই পারেন নি। যশোরের মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বাঙালির বর্ষবরণের দিনটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ল মঙ্গল শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানটিও। মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ঘিরে সাধারণ বাঙালিদের উৎসাহ ও আবেগ ক্রমশ এটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংকৃতির অঙ্গ হয়ে উঠতে সাহায্য করল।

মাহাবুব জামাল শামিম আদতে একজন শিল্পী এবং ভাস্কর। ঢাকায় কি ভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা হয় তা তিনি খুব সুন্দর করে বলেছেন। মঙ্গল শোভাযাত্রার শুরুর দিনগুলিতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, 'এই অসাধারণ অনুষ্ঠানটিতে যারা শুরু থেকে জড়িত ছিলাম তাকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ আর আবেগ যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তা দেখে আমরা এই অনুষ্ঠানটিকে ক্ষুদ্র পরিসরে বেঁধে রাখতে চাইছিলাম না। আমরা চাইছিলাম এই শোভাযাত্রা যেন আপামর বাঙালির প্রাণের আনন্দ হয়ে উঠতে পারে। সকলেই চাইছিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা ছড়িয়ে পড়ুক।

'আমাদের সঙ্গী মোকলেসুর রহমান একজন ছাপাই শিল্পী, হিরণ্ময় চন্দ্র একজন চমৎকার চিত্রকর, আর আমরা তিনজন গ্রাজুয়েশনের পর্ব শেষ করে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় ফিরে আসি। ইচ্ছে ছিল ঢাকায় আমরা একটা শিল্প চর্চা কেন্দ্র গড়ে তুলব। আর এই কাজে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন আমাদের মাস্টারমশাইরা। বহুদিন থেকেই ভাবনাচিন্তা চলছিল। সেইমতো ওই বছরই অর্থাৎ ১৯৮৫-তেই ভাস্কর হাবিবুজ্জামান আর আমরা ক'জনে মিলে যশোরে ''চারুপীঠ'' নামে একটি শিল্প ও ললিতকলা চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলাম। চারুপীঠের শুরুটা হয়েছিল যশোরের পুরাতন কসবার এম এন কলেজের একটি বাড়িতে। আমাদের হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে আমাদের উৎসাহ, আশা ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না।

'চারুপীঠকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিতি দেওয়ার জন্য আমরা ঠিক করলাম একটা জমকালো শোভাযাত্রা করা হবে। এই শোভাযাত্রার একটা লাগসই নামও সকলে মিলে ঠিক করে ফেললাম। ঠিক হলো এর নাম হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা। আসলে এই সবই ছিল প্রদীপ জ্বালানোর আগে সল্‌তে পাকানোর অবস্থা। বাংলা ও বাঙালির সব আবেগকে এক জায়গায় করে করতে হবে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা, এমনই ছিল আমাদের ভাবনা। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই প্রথম আমরা বর্ণাঢ্য পদযাত্রার সূচনা করলাম। প্রচুর মানুষ নানা দিক থেকে এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই পদযাত্রাটা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক আর সমস্ত রকমের ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে। বাংলার ১৩৯২-র সন্ধ্যা ছ'টায় প্রথম ঢাকের বাদ্যি আর বাংলা গানের সুরে আমাদের মঙ্গলযাত্রার সূচনা হলো।

প্রচুর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে রঙবেরঙের সাজে বাংলা গানের সুরে শোভাযাত্রায় নাচছিল। ওদের পোশাক পরিচ্ছদের ভাবনাতেও ছিল নতুনত্ব। বাচ্চারা ফুলের সাজে, জন্তু-জানোয়ারের সাজে শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলছিল। বড়োদের হাতে ছিল বাঙালির চিরন্তন সংস্কৃতির কিছু প্রতীক। পথের দু'ধারে কী প্রচণ্ড আবেগ আর উৎসাহ নিয়ে এই শোভাযাত্রাকে সেদিন স্বাগত জানিয়েছিল তা চোখে না দেখলে বোঝানো কঠিন। আমাদের এই সব কাজকর্মে উৎসাহিত হয়ে যশোরের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠনও এগিয়ে এসেছিল আগামী বছরে আমাদের সঙ্গে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে বলে।

'সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু প্রায় তিন বছরের মাথায় হঠাৎ কিছু ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধ করার জন্য জোর তদ্বির করা শুরু করল। জানা গেল, যেহেতু রমজানের মাস এগিয়ে আসছিল তাই মঙ্গল শোভাযাত্রার জন্য তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে ব্যাঘাত হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা এই শোভাযাত্রা বন্ধ করতে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রবল ভাবে তাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করি। আর প্রচুর সাধারণ মানুষ সে সময় আমাদের মনপ্রাণ দিয়ে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছিলেন। ফলে মঙ্গল শোভাযাত্রা স্বমহিমায় যথাসময়ে পথে বেরিয়েছিল।'

১৯৮৮ সালে মেহবুব জামাল শামিম ও তার সঙ্গীসাথীরা স্নাতকোত্তর পর্বের পাঠ চুকিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। ওখানে তখন খুব ডামাডোল চলছিল। সে সময় বাংলাদেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচ ঢাকার ললিতকলার প্রতিষ্ঠানে এসেও পৌঁছোলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অশান্ত। সাধারণ মানুষও কেউ স্বস্তিতে ছিল না। সর্বত্রই হিংসা ও অশান্তির বিষাক্ত পরিবেশ। এই অস্থির অবস্থায় কিভাবে কিছুটা শান্তি ও স্বস্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে মেহবুব জামাল ও তার সঙ্গীসাথিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সকলে মিলে গোপনে আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো ওই একই বছর ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে জয়নাল উৎসবের দিন খুব জমকালো একটা শোভাযাত্রা বের করা হবে।

পরিকল্পনা মতো সেদিন এক বিশাল মিছিলে খাঁটি বাংলা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বাংলা গানের সুরে গলা মিলিয়ে প্রচুর মানুষ বয়স্ক, যুবক, শিশু রঙিন ফেস্টুন, পতাকা আর আগের মতোই জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরে শহর পরিক্রমা করল। সবচেয়ে আনন্দের কথা সেদিনের সেই মিছিলে 'চারুপীঠ' প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা তো বটেই, ঢাকার ললিতকলা ও ভাস্কর্য বিভাগের প্রচুর শিক্ষক-ছাত্রের পাশাপাশি বিএনপি, আওয়ামি লিগের মতো রাজনৈতিক সংগঠনের মানুষজন যেমন সামিল হয়েছিলেন তেমনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির মানুষ দ্বন্দ্ববিভেদ ভুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন। সেই সময়কার সেই অস্থির-অশান্ত পরিস্থিতিতে কি ভাবে এই শোভাযাত্রা এত সফল ভাবে করা গেল তা ভেবে প্রত্যেকে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন।

পরের বছর বাংলা ১৩৯৬, ইংরেজির ১৯৮৯ পয়লা বৈশাখে আবার মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হলো। এরপর থেকেই ময়মনসিংহ আর বরিশালে নিয়মিত পয়লা বৈশাখ পালন করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। আর সেই থেকেই বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রায় একটি জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে বললেও ভুল হবে না।□

দুর্বার প্রকাশনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অধিকার ভাবনা সম্পাদনা : **শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও স্মরজিৎ জানা** দাম : ৮০ টাকা

নারী ভাবনার বাইশ কথা সম্পাদনা : **তরুণ বসু ও ভারতী দে** দাম : ১০০ টাকা

চেনা দেশ অচেনা মানুষ **স্মরজিৎ জানা** দাম ২০০ টাকা

ভিন্ন নারী অন্য স্বর **তরুণ বসু** দাম ৪০ টাকা

সমাজ সমস্যার সাতসতেরো **স্মরজিৎ জানা** দাম ১৯৫ টাকা

কখনও জিত কখনও হার সম্পাদনা : **স্মরজিৎ জানা, মৃণালকান্তি দত্ত** দাম : ৩০০ টাকা

ONLY RIGHTS CAN STOP THE WRONG Rs 50.00

BABUDER ANDAR MAHAL **Mrinal Kanti Datta** Rs 50

পাওয়া যাবে :

দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ।

এ ছাড়াও কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর, মণীষা গ্রন্থালয়। মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা। ও অন্যত্র।